জনপদবধূ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
রণেন অয়ন্ দত্ত

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অগ্রজ প্রতিমেষু

এই লেখকের :

উপন্যাস

সমুদ্রের গান
এ জন্মের ইতিহাস
শ্বেত কপোত
নীলসিন্ধু
দেবকন্যা
সীমাস্বর্গ
জলকন্যার মন
তীরভূমি

গল্পসংগ্রহ

একটি রঙ-করা মুখ
সিন্ধুর টিপ্
এক আশ্চর্য মেয়ে
নীলাঞ্জন ছায়া (যন্ত্রস্থ)

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূ-বিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ।"
—মেঘদূতম্ ॥ পূর্বমেঘ ॥ ১৬ ॥

"কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক ললনা,
জনপদবধূ কিঙ্কিনী কল-কলনা,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।"
—রবীন্দ্রনাথ

সত্যিই সুপ্রাচীন কোনও জনপদে এসে পড়েছি বলে মনে হয়েছিল। এসব অঞ্চলের বাড়িগুলি যেমন হয় তেমনি নিচু-নিচু আর একতলা বটে, কিন্তু শ্রীর দিক থেকে একটা প্রাচীনত্ব বহন করে চলেছে। সরু সরু থামওয়ালা বারান্দা, জাফরি-কাটা খিলান, মোটা কাঠের দরজায় নানান রকমের ফুল-লতাপাতা আঁকা। এমন কি, অলিন্দে ভবন-শিখীরও অভাব নেই দেখেছিলাম। পেখম ধরে নি তখন, কিন্তু লম্ববান বিচিত্র পুচ্ছ ধারণ করে মাথার ঝুঁটি দুলিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছে। ঝরোঝরো বর্ষণের দিনে মেঘডম্বরুর তালে-তালে ভবন-শিখীকে নাচাবার মতো ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ তরুণী পথিক-ললনারও যে অভাব হবে না, জানলার ফাঁকে দুটি-একটি ভাবাকুললোচনার মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম।

বাড়ির দরজায় সিঁদুরে-আঁকা একটি চক্রবন্ধনীর মধ্যে স্বস্তিকা-চিহ্ন মুদ্রিত রয়েছে দেখে আমার সঙ্গী পাম্বলু বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই এসেছি। এই বাড়ি।"

বলে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় বার-কয়েক ঘা দিতেই খুলে গেল দরজা।

ভাগ্য ভাল, লম্বা প্যান্টের ওপরে সাদা-হাফশার্ট-পরা হাই-পাওয়ারের-পুরু-কাচের-চশমা-চোখে আমাদের সেই চেনা ছেলেটিই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমার সঙ্গীকে বললে, "আরে আসুন, আসুন পাম্বলু গারু। আপনারা কিন্তু দু ঘণ্টা লেট। আমরা বসে বসে শেষে কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আর কি!"

আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পাম্বলু রসিকতা করে বললে, "লেট হই আর যাই হই, শেষ পর্যন্ত এসেছি তো?"

হেঁ-হেঁ করে হেসে ছেলেটি বললে, "তা যা বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত অনেকে আবার পিছিয়ে যায়।"

বছর সাতেক এসব অঞ্চলে কর্মব্যপদেশে ঘোরাঘুরি করছি, সুতরাং ওদের ভাষা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না আমার। আমি ততক্ষণে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, যে ঘরখানায় আমরা প্রবেশ করেছি সেই ঘরখানা।

ছোট ঘর। প্রকাণ্ড একটা তক্তপোশ, বলা যায় সারাটা ঘর জুড়েই রয়েছে সেটা। তার ওপরে সাদা ধবধবে একটা চাদর রয়েছে টান-টান করে পাতা। তার ওপরে এক কোণে একটা কাঠের হাতবাক্স আর জলচৌকি পাশাপাশি সাজানো। জলচৌকির ওপরে একটা লাল খেরো-বাঁধানো খাতা, বিচিত্র একটা গোলাকার দোয়াত আর পাখির পালকের কলম।

ছেলেটি আমাদের তক্তপোশের ওপর বসিয়ে রেখে ভিতবে চলে গেল। ভিতরের দিকের একটিমাত্র দরজা। সেও এমনি মোটা আর কালো কাঠ দিয়ে তৈরি, নানান নক্‌শা কাটা। নক্‌শার মধ্যে শতদল পদ্মই সাজানো রয়েছে বেশি। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি কাঠের মূর্তি—গণেশের। ললাটে কুঙ্কুমের টিপ, দুটি একটি দোপাটি ফুল পড়ে আছে পায়ের কাছে, আর জ্বলছে ক্ষুদ্রকাব শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে কয়েকটি ধূপ।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, ভিতরে যাবার দরজাটি ওরা সব সময়ে ভাল করে বন্ধ রাখে। এই যে ছেলেটি ভিতরে গেল, যাবার সময় সন্তর্পণে কপাটটি টেনে ভেজিয়ে দিতে তার ভুল হয় নি। কিন্তু মুহূর্তের সেই ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে না পেলেও শুনতে পেয়েছিলাম একটি সুর। মেয়ে-কণ্ঠেই সুরেলা একটা তান উঠেছে—ভৈরবীর মতোই করুণ আর আবেগ-বহুল।

পাম্বলু বোধ হয় আমারই মত অবাক হয়ে দেখছিল চারিদিক। ঘরের দেয়ালগুলিই সব থেকে অদ্ভুত। পুরু পাথরের দেয়ালের কোনও কোনও জায়গায় স্থাপনা করা হয়েছে কালো পাথরের দেবমূর্তিগুলি,

তেল মাখিয়ে উজ্জ্বল করে রাখা। প্রতিটি মূর্তিরই ললাটে কুঙ্কুম, পায়ে দোপাটি ফুলের পাপড়ি আর শ্বেতপাথরের ধূপাদানিতে ধূপ। ফলে, সমস্ত ঘরটি জুড়ে আছে ধূপের গন্ধ। ঘরখানার বাইরের দিকে ছোট্ট একটি জানলা, সেই জানলা দিয়ে চিকচিক করতে করতে ঘরে এসে ঢুকছে দুটি-একটি চড়াই পাখি, কোনও-কোনও দেবমূর্তির পায়ের কাছে এসে বসছে, তার পরেই উড়ে যাচ্ছে।

পান্থলু বললে, "মনে হচ্ছে বাবু, সত্যি-সত্যিই এক দেবালয়ে এসেছি, না?"

বললাম, "হ্যাঁ। তাই বটে।"

মূর্তি ছিল নয়টি। সূর্যমূর্তি, চন্দ্রমূর্তি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু—নবগ্রহ।

বললাম, "তুমি এখানে আগে কখনও আস নি?"

পান্থলু বললে, "এসেছি। সে বহু আগে। এ ঘরের ঠিক চেহারাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

তারপবে, একটু থেমে, অদ্ভুত এক ভয়-ভয়-করা কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না। কী বাবু, ফিরে যাবে?"

সংক্ষেপে বললাম, "না।"

পর-মুহূর্তেই ভিতরের দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল সেই ছেলেটি, তার সঙ্গে একটি লোক। লোকটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আবার শুনলাম সেই অপরূপ সুরবিস্তার, একাকিনী ভৈরবীর সেই সকরুণ মিনতি!

লোকটি মধ্যবয়সী, কিন্তু বিরাটকায়। কানে সাদা দুটো পাথর-বসানো মাকড়ি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের নমস্কার জানিয়ে জল-চৌকির সামনে এসে বসল।

আজ এর সম্বন্ধে আমার যে ধারণাই হয়ে থাক্‌, সেদিন চেট্টিবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল, ভয়ানক গম্ভীর স্থূলরুচিসম্পন্ন একটি লোক। পরে একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছিলাম কথাটা। বলেছিলাম,

"এই পর্বতপ্রমাণ দেহটির মধ্যে তোমার ওই জ্যোতির্ময় মণির মতো মনটি লুকিয়ে রেখেছিলে কোথায় ?"

শুনে মৃদু একটু হেসেছিল, বলেছিল, "বাবুজী, আমি সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়িয়েছি এক সময়, আমার কী মনে হয় জান ? এত সুন্দর দেশ বোধ হয় আর কোথাও নেই। না, শুধু বাইরের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তর্লোকে যে অপূর্ব এক সুন্দর রাজ্য আছে, তা আবিষ্কার করতে পারলে মহান এক ভাবে বিভোর হয়ে যেতে হয়।"

কিন্তু সে সব পরের কথা হবে পরে। চেট্টি পান্থলু গারুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রলোক কোথাকাব ?"

পান্থলুকে আগে থাকতে সব শেখানো ছিল, সে আমাব পবিচয় না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, "এসব না বললে চলবে না বুঝি ?"

চেট্টি তার লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে হাতে পাখের কলম তুলে নিয়ে বসে আছে, বললে, "কেন চলবে না ? কিন্তু বাবুজীকে একবার আমার সামনে আসতে হবে।"

নির্দেশমতো ওব সামনে গিযে বসলাম। চেট্টি দুই চোখেব প্রখব দৃষ্টি মেলে আমাকে পর্যবেক্ষণ কবতে লাগল। এতে পান্থলু আশ্চর্য বোধ করলেও আমি অবাক হই নি। নানান দেশে নানান ধরনেব লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে। আমি ওর দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, ও আমার মধ্যে কী দেখতে চায়। আমি ওদেব ভাষা ভাঙা ভাঙা বলতে পারতাম, বললাম, "না, আমার স্বাস্থ্যে কোনও খুঁত নেই।"

মৃদু একটু হেসে চেট্টি বললে, "চোখের কোণ দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি বাবুজী। সেটুকু শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদের আছে।"

তারপরেই হাত বাড়িয়ে বললে, "কুড়িটি টাকা লাগবে।"

পিছন থেকে হৈ-হৈ করে উঠল পান্থলু, "কেন ? কুড়ি টাকা কেন ? তেমন তো কথা ছিল না ? কী হে বিশ্বনাথম্ ?"

চশমা-চোখে ছেলেটির নাম বিশ্বনাথম্, সে মাথা চুলকে আমতা আমতা করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে চেট্টিবাবু বলে উঠল, "পান্থলু গারু, বাবুজীকে দেখেই বুঝেছি বড়ঘরের মানুষ। ওঁকে আমরা বড় আসনেই অভ্যর্থনা করতে চাই।"

পান্থলুকে আর-কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে চেট্টির হাতে আমি গুঁজে দিলাম কুড়িটি টাকা। চেট্টি সেটা বাক্সে রেখে তার খেরো-বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে কি যেন লিখতে লাগল।

বাইরে থেকে ময়ূরের ক্রেঙ্কার ভেসে এল এই সময়। বারান্দার খোপে-খোপে পায়রাগুলিও বোধ হয় ডাকতে লাগল—বক্‌বকম্ বক্‌বকম্।

পান্থলু বললে, "বৃষ্টি এল বলে।"

বিশ্বনাথম্ উত্তর দিল, "না। মেঘ করে এসেছে। তবে বর্ষা নামতে পারে।"

বলতে না বলতেই বাইরের দরজা ঠেলে ভিতরে এল কে একটি লোক, কণ্ঠে গুন গুন করছে একটা গানের কলি—গরজে ঘটাঘন, কারে কারে পাবস ঋতু আঈ, দুল্‌হন মনভায়ে!

সুর কানে যেতেই মুখ তুলল চেট্টিবাবু, বললে, "আরে এস, নটরাজন। কবে এলে?"

লোকটির বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, গায়ের রঙ কালো হলেও বেশ একটা লাবণ্য আছে চেহারায়, চোখ-মুখও বুদ্ধিদীপ্ত। সে তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়ে বললে, "এই তো আজ এলাম।"

এদেশীয় লোকের মুখে হিন্দী গানের ভাষা শুনে আমিও একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম লোকটির মুখের দিকে। আমাদের সবার প্রতিই একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল, নিরুৎসুক ছুটি ভাবময় চোখে, বললে, "আসছি সেই জয়পুর থেকে। বেশ কাটল কয়েকটা দিন।"

চেট্টি বললে, "উঠেছ কোথায়? সরস্বতী আম্মার ওখানে?"

নটরাজন বললে, "হ্যাঁ, আমার আর কে আছে বল?"

তারপর চশমা-পরা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে, "কী হে? কেমন আছ তোমরা বিশ্বনাথম্? ভামতীর খবর কী?"

ছোকরাটি ত্রাস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখে তর্জনী স্থাপনা করে ইঙ্গিতে বোধ হয় জানাতে চাইল—চুপ। ওসব কথা এখানে নয়।

চেট্টি সোজা হয়ে বসে ছিল ততক্ষণ, বললে, "আচ্ছা বাবুজী, তা হলে এবার আপনারা আসুন। ঠিক সন্ধ্যার সময় আসবেন।"

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। পাস্থলু বললে, "আমি আসব না সঙ্গে, বাবুজী একাই আসবেন। দেখবেন যেন কোনও অসুবিধা না হয় ওঁর।"

চেট্টি হাসল, বললে, "কিছু ভাববেন না পান্থলু গারু। আপনার বাবুজী জলে পড়বেন না এসে।"

কপাট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে তখনও শুনছি নটরাজনেব কণ্ঠস্বর। গুন গুন ছেড়ে এবার সে জোরেই তান ধরেছে—গরজে ঘটাঘন…

যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলাম, সেটি ঘনশ্যামদাস বলে এক মারোয়াড়-দেশীয় ব্যবসায়ীর গদির উপরকার দোতলা। দোতলা বাড়ি এ-অঞ্চলে নেই বললেই চলে, যে দু-তিনটি আছে তার মধ্যে হলদে, লাল আব ঘন সবুজ—এই তিন রঙে রঙ-করা এই বাড়িটি অন্যতম।

যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে এখানে আমি এসেছি, তাদের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসজীর ব্যবসায়সূত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাব জন্যই আমার পক্ষে এই অভাবিত স্থানলাভ করা সম্ভব হয়েছে, নইলে এ-অঞ্চলে এক দূরবর্তী ডাক-বাংলোটি ছাড়া আর-কোনও বাস করবার উপযুক্ত জায়গা নেই বললেই চলে।

সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে ধপ করে এলিয়ে দিলাম নিজেকে, বেশ বেড়ে গেছে বেলা। আমার কাছে কাজের ব্যাপারে লোকজন এইবার আসতে শুরু করল বলে।

আমাদের বাড়িটির সামনেই ছোট্ট একটা ত্রিকোণ পার্ক। নাম দিয়েছে—গান্ধী পার্ক। এক পাশে একটা পেট্রোল-পাম্পের দোকানের সামনে একটা ধুলিধুসরিত সবুজ রঙের বাস অপেক্ষা করছে; যাত্রীভর্তি হয়ে যাওয়ায় কণ্ডাক্টার আর যাত্রী নিচ্ছে না, কিন্তু কতকগুলি লোক বাসে ওঠবার জন্য কলরব করতেও দ্বিধা করছে না। লোকগুলির মধ্যে কারুর কারুর মাথায় পাগড়ি আর সকলের কাঁধেই তোয়ালে।

অদ্ভুত এই জনস্থলীটি। নানা কারণে এর নাম দেওয়া যাবে না। একটি সুবৃহৎ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। পার্বত্য ভেষজ, তামাকপাতা এবং আরও বহুবিধ দ্রব্যাদির বড় ব্যবসায়কেন্দ্রও একে বলতে পারা যায়। অথচ, মূল শহরগুলি থেকে বহুদূরে এই পল্লী, রেল-লাইন সেই চল্লিশ মাইল বাসের ধুলিধূসরিত পথ পেরিয়ে একেবারে নরশাপুর।

পান্থলু ভিতর থেকে ঘুরে এসে বললে, "ঘনশ্যামদাসবাবু গদিতে গিয়ে বসেছেন। যাবেন নাকি একবার নিচে?"

আমার বাঁ দিকে কাঠের পার্টিশন করে বারান্দাটা ভাগ করা, বাড়ির ওই অংশে থাকেন তিনি স্বয়ং। ঘর-সংসার সব ফেলে এসেছেন সেই সুদূর মারোয়াড়ের কোন অঞ্চলে কে জানে! দুটি নাকি পুত্র, তার ছোটটি থাকে মায়ের কাছে, বড়টি দিল্লিতে। ঘনশ্যামদাসবাবুর ভাষায়, বড়টি কালেজে পড়ছে, শীগগিরই আই-এ পাস করে বেরবে। বহুৎ এলেমদার নও-জোয়ান। তবে এখানে আনছি না, কলকাতায় গদি খুলে সেখানে বসাব তাকে। তখন আপনি একটু দেখবেন তাকে বাবুজী। দেখবেন কী, যে, আলতু-ফালতু লোক এসে তাকে যেন না ঠকায়! বেশক্, সে-ও পড়িলিখি আদমী, তাকেও ঠকানো মুশকিল হবে। ঘনশ্যামদাসবাবু এখানেও একটি সংসার করেছেন। সন্তানাদি অবশ্য আসে নি এ-সংসারে, তবে ভদ্রমহিলা যে দক্ষিণী হয়েও পর্দানসীনা, এটা এ কয়দিনেই বুঝে গেছি।

ঈজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পান্থলুকে বললাম, "চল।"

গণেশজীকে প্রণাম করে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে সবেমাত্র গদিতে

আসীন হয়েছেন ঘনশ্যামদাসবাবু। আমাকে বিশেষভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন বাবুজী, আসুন, বসুন।"

নমস্কার জানিয়ে আমি আর পাম্বলু আসন গ্রহণ করলাম। পাম্বলু বসল গদিতে, আর আমার পরনে প্যাণ্ট থাকায়, বসলাম গিয়ে চেয়ারে। ঘনশ্যামদাসবাবুর হাতে কাঁসার ঝকঝকে একটা থালা, তাতে গোটা দুই হাতে-চাপড়ানো প্রকাণ্ড রুটি আর একতাল কিশমিশ-দেওয়া হালুয়া। গণেশ-মূর্তির দিকে থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বার-কয়েক আরতির ভঙ্গিতে হাত দুটি আন্দোলিত করে ডেকে উঠলেন, "বাচ্চু! বাচ্চু!"

ঘনশ্যামদাসবাবুর প্রাতরাশ সমাপ্ত হয় নি দেখে উঠে যাব কি যাব না এ-কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখি টুন-টুন-টুন-টুন শব্দ করতে করতে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল কালো মতন কী একটা জন্তু। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি, পরে ভাল করে তাকিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময় আর সীমারেখা মানল না। গলায়-সোনার-ঝুমঝুমি পরানো প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর। হ্যাঁ, আকারে একটা বেড়ালেরও বড় হবে। ছোট ছোট চারটি পা ফেলে বেজির মতন গোলাপী ঠোঁট মেলে রুটি দুটি একসঙ্গে টেনে নিল মুখের মধ্যে, তারপর আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্তরালে।

পাম্বলু ঘনশ্যামদাসবাবুরই লোক, এ সব দেখতে হয়তো সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই সে ওসব দিকে দৃক্‌পাত না করে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বাজার-দরের পৃষ্ঠাটা খুঁজতে লাগল। আমি সাধারণত এত সকালে কাজে বসি না, তাই দিনকয়েক হল এখানে এসেছি বটে, তবু এসব কিছু আগে লক্ষ্য করতে পারি নি। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলাম, "ওটা কি শেঠজী, ইঁদুর?"

থালাশুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে শেঠজী বললেন, "গণেশজীর বাহন।"

"পুষেছেন?"

"আরে রাম-রাম," শেঠজী আবার গণেশজীর উদ্দেশে নমস্কার

জানালেন, "পুষেছি বলবেন না বাবু, বাচ্চু দয়া করে আমার ঘরে আছে। ও চলে গেলে আমার ব্যবসায়ের পড়তা থাকবে না, লক্ষ্মীমায়ীও থাকবেন না, আমি মরে যাব।"

টুং টুং করতে করতে বাচ্চু আবার এল ঘরে। শেঠজীর হাত থেকে হালুয়ার তালটা টুকরো-টুকরো করে ভেঙে খেতে লাগল নির্ভয়ে। আর শেঠজী বার বার অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন।

ওর খাওয়া আর শেঠজীর মন্ত্র শেষ হলে বললাম, "কোথায় থাকে?"

টুং-টুং করতে করতে চলে গেল ইঁদুরটা। সেই দিকে সস্নেহে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপরে বললেন, "থাকে কোথাও বাড়ির আনাচে-কানাচে। ডাকলেই আসে। ওর গলাব ঝুমঝুমি গড়িয়ে দিয়েছি, এবার আমাদের ওই কাজটা হাতে এলে বাবুজী, মানত করেছি, ওর কানের মাকড়িভি গড়িয়ে দেব।"

যে কাজের এইমাত্র ইঙ্গিত করলেন ঘনশ্যামদাসবাবু, ওই কাজের ব্যাপারেই আমার এখানে আসা। এই জনস্থলীর পাহাড়ের সানুদেশে বেশ কিছু অংশ জুড়ে ম্যাঙ্গানীজ ওরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর লীজ নিয়েছেন শেঠজী নিজে, দীর্ঘদিনের মেয়াদী লীজ, আমি এসেছি এই ম্যাঙ্গানীজ-স্তরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে পরীক্ষা করতে। যদি ভাল পারসেণ্টেজের ওর পাওয়া যায়, সেটা আশা করছি আমরা পাব, তা হলে শেঠজী আর আমাদের ফার্মের যোগাযোগে একটা লাভজনক ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে।

বললেন, "ভাইজাগ থেকে আজকাল বেশী ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হচ্ছে বাবুজী, আমি দেখে এসেছি। আপনি কি মনে করেন—এ ব্যবসাটা চলবে?"

"চলবে মানে?"

"মানে হচ্ছে কি, গভর্নমেণ্ট না আবার ঝট করে বন্ধ করে দেয়। আমাদের দেশী গভর্নমেণ্টের ব্যাপার তো এখন।"

বললাম, "উপায় নেই গভর্নমেণ্টের। ম্যাঙ্গানীজ বাইরে পাঠাতেই হবে। নইলে ডলার আর্নিং চলবে কী করে?"

"ডলার আর্নিং ব্যাপারটা কী বাবুজী?"

শেঠজীকে সংক্ষেপে বোঝালাম ব্যাপারটা।

ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল কাজের চাপ। স্নানাদি ভোরেই সেরে নিয়েছিলাম, হোটেলে খেতে যেতে হয়ে গেল বেশ দেরি, বেলা ছুটো। পাস্থলুকে শেঠজী দিয়েছেন আমার দেখাশোনা করতে। সে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে। তার বাড়ি এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে,—কী এক নামের অগ্রহারম্মে যেন। অগ্রহারম্ বলে ব্রাহ্মণ-পল্লীকে, পাস্থলু জাতিতে ব্রাহ্মণ।

হোটেলে আমার খাবার টেবিলের সামনে বসে পাস্থলু বলছিল, "শেঠজীর গদিতে কাজ করি কমিশন হিসাবে নেহাতই পেটের দায়ে। নইলে বামুন মানুষ, আমারই কি চাকরি করা উচিত?"

"তুমি তো বেশ লেখাপড়া করেছ, ইংরাজি লেখা তো তোমার ভালই দেখলাম।"

প্রসন্ন ভঙ্গিতে পাস্থলু বললে, "তা স্যার, আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম অন্ধ্র য়ুনিভারসিটিতে। পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে হয়েছিল। ওই বিশাখাপত্তনমেই এক স্টিভেডোরের ফার্মে কাজ নিয়েছিলাম। আমার অফিস-মাস্টারের নাম ছিল মুখার্জিবাবু। বেশ লোক। আমি আই-এ পড়তে পড়তে টাইপ শিখেছিলাম তো! মুখার্জিবাবু আমার ঝড়ের বেগে টাইপ করা দেখে খুব খুশী হতেন। বলতেন, 'সাবাস পাস্থলু গারু, সাবাস।' কিন্তু স্যার, শেষে ওই টাইপ করাই আমার কাল হল। শেষ পর্যন্ত চাকরি রাতারাতি ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এলাম।"

"কেন?"

বললে, "একটা জাহাজে খাবার-দাবার সাপ্লাই করা হয়ছে। তার বিল টাইপ করে চলেছি। রাইস এক হাজার পাউণ্ড, আটা আট শো পাউণ্ড, পোট্যাটো ছু শো পাউণ্ড, কিন্তু তারপরের আইটেমে এসেই

টাইপ করা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হল। বললাম, "না স্যার, ওটা আমি টাইপ করতে পারব না। আমি হিন্দুর ছেলে, তায় ব্রাহ্মণ।"

বলে উঠলাম, "কী টাইপ করতে পারলে না পান্থলু? বীফ?"

সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে কানে আঙুল দিল পান্থলু, বললে, "আ ছি-ছি, কথাটা উচ্চারণ করে ফেললেন! দাঁড়ান, হাত মুখ ধুয়ে আসি।"

ওর অবস্থা লক্ষ্য করে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ফেরার পথে পান্থলু এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, "একটা কথা বলব বাবু?"

"কী?"

"সন্ধ্যার সময় ওখানে যাবেন?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে বললাম, "যাবই তো। তোমার কি আপত্তি আছে নাকি পান্থলু?"

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আ ছি-ছি, তা নয়। গেলে শেঠজী খুশীই হবেন। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

বললে, "যত লোক এ যাবৎ শেঠজীর কাছে এসেছে, তাদের থেকে আপনি একটু ভিন্নপ্রকৃতির। তাই বলছিলাম, নাই বা গেলেন ওখানে!"

একটু হেসে বললাম, "শেঠজীর কাছে আর যারা এসেছে, তাদেরও সঙ্গী ছিলে নাকি তুমি পান্থলু?"

"না বাবুজী," পান্থলু বললে, "তারা সন্ধ্যার সময কি যা-তা খেত বলে আমি কাছে ঘেঁষতাম না। কি বিশ্রী গন্ধ, যেন ঠেলে বমি আসবে!"

"আচ্ছা, এই বিশ্বনাথম্ ছোকরা কি আগেও আসত? এসে ঘুরঘুর করত আশেপাশে?"

"না। ওকে দেখছি তো এই হালে। তবে, শেঠজীর অন্দরমহলে ওর আসা-যাওয়া ছিল আগে থাকতেই।"

"ও!"

নিজের পরিচিতি সহজে দেব না বলেই প্যাণ্ট শার্ট আর টাই পরে গিয়েছিলাম। চেট্টিবাবুর ঘরে সেই নটি মূর্তির পায়ের কাছে জ্বলছে নটি ক্ষুদ্রকায় প্রদীপ, নটি দেবতার গলায় ঝুলছে নটি বেলকুঁড়ির মালা। তেমনি ধূপের গন্ধে সারা ঘর আমোদিত। একটি কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প শোভা পাচ্ছে জলচৌকির উপরে। ভদ্রলোক তন্ত্রসাধকের মতো লাল একটা পট্টবস্ত্র পরে আছে, খালি গায়ে রক্তকরবীর মালা, কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

আমি ভিতরে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল চেট্টিবাবু, বলল, "বসুন।"

বসলাম। আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভিতরের সেই কাঠের নকৃশা-করা দরজাটা তেমনি বন্ধ করা। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য, এমন একটা থমথমে ভাব আছে যে, তার প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে হতে বাধ্য।

বললাম, "বাইরের দরজা বন্ধ করলে কেন ?"

অল্প একটু হেসে বললে, "আপনার সঙ্গে কথা বলব বলে। যারা আসবে বাইরে তারা অপেক্ষা করবে। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলেই দরজা খুলে দেব। এতে কোনও অসুবিধা নেই, আপনি ছাড়া সবাই পুরনো, সবাই জানে আমাদের নিয়ম-কানুন।"

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, "বাবুজী, আমাদের নিয়ম-কানুন আপনাকেও মানতে হবে। এই ঘরে বসে বলুন, মানবেন ?"

সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবমূর্তির থেকে রাহু আর কেতুর মূর্তির মধ্যেই যেন একটা তীক্ষ্ণ তিরস্কার লুকিয়ে আছে মনে হল। আমার মতন শক্ত দশ-দেশ-ঘোরা লোকেরও বুকের ভিতরটা বার কয়েক কেঁপে উঠল। বললাম, "কী নিয়ম, বল ? মানব।"

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল চেট্টিবাবুর মুখ, হাতের কাছের সেই লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাটা খুলে কী যেন দেখতে লাগল একমনে, দু-একটা পৃষ্ঠাও উলটে গেল, তারপরে বললে, "বাবুজী একটা ফুলের নাম করুন।"

"ফুলের নাম! কেন?"

হেসে বললে, "আমাদের নিয়ম মানবেন বলেছেন। করুন একটা ফুলের নাম।"

গলায় ওর দুলছে রক্তকরবীর মালা, গণেশজীর পায়ের কাছে তখনও শুকিয়ে আছে সকালের সেই দোপাটি ফুল, সেখান থেকে চোখ গেল নবগ্রহের নটি মূর্তির দিকে। নটি বেলকুঁড়ির মালা। তাকালাম ভিতরের সেই পদ্মফুলের-নক্‌শাকাটা কাঠের দরজাটির দিকে। রক্তকরবী, দোপাটি, বেলকুঁড়ি আর পদ্ম। কিন্তু কি আশ্চর্য ঘটনা, আজও মনে মনে ভেবে অবাক হয়ে যাই, এই চারটে ফুলের নাম করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা করি নি। কেন করি নি, আর কেন যে বেছে বেছে মনের কোণে চাঁপাফুলের নামটিই ফুটে উঠল, তার সঠিক কারণ আজও আমি নির্ণয় করতে পারি নি।

হ্যাঁ, স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিলাম, "চাঁপাফুল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে আমার দিকে তাকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটায় কি যেন দেখল চেট্টিবাবু, তারপরে উঠে দাঁড়াল, ভিতরের দরজাটি ঈষৎ উন্মোচিত করে কাকে যেন ডাকতে গিয়েও ডাকল না, শুধু আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, "আসুন বাবুজী, আমার সঙ্গে আসুন।"

"ব্যাপারটা কি চেট্টিবাবু? ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন?"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললে, "সেটা পরেই জানতে পারবেন।"

দরজা পেরিয়ে যেন এক রহস্যলোকে প্রবেশ করলাম আমরা, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা, থাম বসানো, মাঝখানে একটা বাঁধানো উঠন-চতুষ্কোণ।

বারান্দার দেয়ালে কিছু দূর অন্তর অন্তর কেরোসিনের দেয়ালগিরি বসানো। তারই বদ্ধালোকে দুটি-একটি হাস্যোজ্জ্বল তরুণী-মুখ চোখে পড়তেই চট করে সরে গেল তারা। কোন একটি কক্ষের কপাটের অন্তরাল থেকে ইমনকল্যাণের তানমালা আসছে ভেসে—মেয়েলী গলার সুরেলা তান।

চেট্টিবাবু আমাকে নিয়ে উঠনে নামলেন। উঠনের ওপরে বিস্তৃত আকাশের যেটুকু চোখে পড়ে তাতে দেখলাম, সন্ধ্যাতারা তখনও বিদায় নেয় নি। আধফালি চাঁদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল।

উঠনের এক দিকে ছুটি প্রোথিত লৌহস্তম্ভের মধ্যে একটি দোলনা খাটানো ছিল, কারা যেন ঝুলছিলও সেই দোলনায়। আমরা কাছে যেতেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল ছুটি মেয়ে, পিছন থেকে চেট্টিবাবু ডেকে উঠল, "চম্পা!"

যে মেয়েটি আগে ছুটে গিযেছিল, বারান্দায় উঠবার সিঁড়িতে সে থমকে দাঁড়াল। আবছা আলোয় তাকে ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। চেট্টিবাবু দ্রুতপায়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কি যেন বললে ফিসফিস করে, সে মাথা হেলিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল ওখান থেকে।

চেট্টিবাবু আমার কাছে ফিরে এসে আমার হাত ধবে বললে, "আসুন।" আমরা সেই বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

দেয়ালগিরির তেমনি অনুজ্জ্বল আলো শোভা পাচ্ছে ঘরে। এক পাশেএকটা খাট, অন্য দিকে মেঝের উপরে একটা লাল পশমের আসন পাতা। চেট্টি এক ধার থেকে একটি মোড়া টেনে নিয়ে বললে, "আপনি বসুন। ও এখুনি আসছে।"

চেট্টিকে অপসৃয়মাণ দেখে আমি যেন তাড়াতাড়ি কি বলতে গিযে-ছিলাম, চেট্টি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললে, "আপনার সব-কিছু প্রশ্নের উত্তর এখুনি পাবেন। আমি যাই, কেমন?"

প্রথম দিকে একটু অস্বস্তিকর মনে হতে বাধ্য। তারপরে, ধীরে ধীরে চোখ মেলে ভাল করে দেখতে লাগলাম ঘরখানা। সব-কিছুই নিপুণ হাতে সাজানো, গোছানো, ঝকঝকে, তকতকে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি পাথরের ছোট্ট বিষ্ণুমূর্তি, পিতলের পিলসুজে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে একমুঠো ফুল অঞ্জলির মতো পড়ে আছে মূর্তির পায়ে। আর পুড়ছে ধুপদানিতে ধূপ।

হঠাৎ টের পেলাম, খোলা দরজা দিয়ে, বারান্দার দিকে যে জানলাটি বিদ্যমান তার ফাঁক দিয়ে বহু মুখ উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে চায় আমাকে। ফিসফিস করা দুটি একটি কথা, পায়ের মৃদু ধ্বনি, চুড়ির ঝনৎকার, টুকরো টুকরো চাপা হাসি, বুঝি নতুন কোনও বাসরঘরের বিভ্রম সৃষ্টি করতে চায় ওরা।

আর আশ্চর্য, নববধূর মতই জড়িত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ঘরে এসে আবির্ভূতা হল সে। দুটি মেয়ে তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে এল। হাতে তার একটা ডালা। ডালার নানান দ্রব্যের মধ্যে একটি ছোট্ট মাটির প্রদীপ। মেয়ে দুটি ওকে পৌঁছে দিয়ে আমার দিকে একটু তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের একটা শাড়ি পরনে, অলঙ্কারের মধ্যে নাসিকায় একটি শুভ্র পাথরের ফুল ঝলমল করছে, কর্ণেও ঝিলমিল করছে দ্যুতিমান দুটি শুভ্র পাথরের দুল। গলায় সরু একটা সোনার হারের উপরে বেলকুঁড়ির মালা, কোমরে আর বাহুতেও বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো। হাতে দুগাছি গালা-দিয়ে-তৈরী নক্‌শা-কাটা বালা। কিন্তু সব অলঙ্কার, সব বেশ-বাস তুচ্ছ হয়ে গেছে তার আপন দেহলাবণ্যের কাছে।

দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণীর মূলে ফুলের মালা জড়ানো, জরির কাজ করা ময়ূরকণ্ঠী রঙের চোলির 'রবিকা' বা ব্লাউজের বন্ধনীতে সুশোভিত তার বক্ষসম্পদ। একটু হলদে ধরনের ফরসা ওর দেহের বর্ণ, নাসিকার গঠনও হয়তো খুব তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু কৃষ্ণকলিফুলের কুঁড়ি সদ্য ফুটলে যেমন দেখতে লাগে, তেমনি স্ফুরিত ওর রক্তিম অধর, আর পরম আশ্চর্য যদি কিছু থাকে তো সে ওর ঘনপক্ষ্ম টানা টানা দুটি ভাবময় চোখ।

আমার দিকে ভীরু পাখির মতই মুহূর্তকাল তাকিয়েছিল সে। তারপরে নিমীলিত চোখে হাতের ডালাটি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। পায়ের কাছে রাখল সেই ডালা। আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ডান হাতে তুলে নিল প্রদীপখানি, বাঁ হাত ডান হাতের

বাজুতে ছুঁইয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরণ করতে লাগল আমাকে। প্রথমে প্রদীপ, তারপরে ফুল, তারপরে ছোট্ট একটা মাটির ঘট। এর পরে দু-এক বিন্দু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল আমার উপরে, ছিটিয়ে দিল নিজের উপরেও।

তারপরে ডালাটি মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াল, হাতের ইশারায় বললে লাল পশমের আসনটিতে বসতে। নিদারুণ কৌতূহল নিয়েই এতক্ষণ নিশ্চুপে লক্ষ্য করে চলেছিলাম ওর কার্যকলাপ, এবারে আর থাকতে পারলাম না, ভাঙা ভাঙা ওদেরই ভাষায় বলে উঠলাম, "যদি না শুনি তোমার কথা ?"

উল্লাসের দ্যুতিতে ঝলমল করে উঠল দুটি চোখ, বিস্মিত ভঙ্গিমায় একখানা হাত আরক্তিম কপালের ওপর ছুঁইযে রেখে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য! জানেন আপনি আমাদের ভাষা ?"

"কিছু কিছু জানি।"

"অনেক দিন আছেন বুঝি আমাদের দেশে ?"

"তা আছি।"

ভারি কোমল, সরু আর সুরেলা ওর কণ্ঠস্বর, বলাব ভঙ্গিও মৃদু, বললে, "বসবেন না এসে আসনে ?"

"না।"

ধীরে ধীরে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল, আমার বহুমূলে তার কোমল করপরশটুকু রেখে প্রায় অস্ফুট স্বরেই বলে উঠল, "না বলতে নেই। আমার কথা আজ শুনতে হয়। আমার ঘবে এসেছেন, আমার রাজত্বে এসেছেন, আর আমার কথা শুনবেন না ?"

ডালাটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলাম, "কিন্তু এসব কী ?"

একটু ঝুঁকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসল, বললে, "এসব অনুষ্ঠান আমাদের করতে হয়।"

"কেন ?"

ধীরে ধীরে তার করপল্লব উঠে এল বাহুমূল থেকে আমার শিরে,

াচরুান ছোয়ানোর মত আঙুল দিয়ে মাথার চুলে খেলা করতে করতে বলে উঠল সে, "মানুষ তো মানুষের অন্তরটা দেখাতে পারে না, তাই কতকগুলি প্রতীক দিয়ে অন্তরের ভাবটি সে প্রকাশ করে। ওই যে ডালার ছোট্ট দীপটি জ্বলছে, যা দিয়ে আপনাকে আজ বরণ করে নিলাম, ও তো আমারই অন্তরের অন্তরতম প্রদীপ-শিখার প্রতীক, নয় কী?"

"দূর!" উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, "রাখ এসব বানানো কথা, আমি কিন্তু দেরি করতে পারব না, রাত নটার মধ্যেই আমার হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।"

প্রথমটায় অদ্ভুত একটা বেদনার পাণ্ডুরতা জেগে উঠেছিল তার মুখে, ধীরে ধীরে সেই বেদনার স্পর্শ মুছে গিয়ে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন কৌতুকের দ্যুতি, হয়তো বা স্নেহেরও। বললে, "আমার নাম কী বলুন তো?"

বললাম, "চম্পা। আচ্ছা, তোমাদের সবারই কি ফুলের নামে নাম?"

কৌতুকহাস্যে তখনও ঝলমল করছে ওর মুখ, মাথা নেড়ে নীরবেই জানাল, "হ্যাঁ।"

"এ-রকমটা কী করে হল? সবই পাতানো নাম, না?"

"হবে।"

বললাম, "যদি অন্য কোন ফুলের নাম করতাম তো তোমার কাছে আসা হত না আমার, না?"

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে, "না।"

"ওই নিয়ম কেন?"

খুব কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, "নিয়মটা ভাল না?"

বলে উঠলাম, "দূর। বাজে।"

"উঁহু। বাজে নয়, কাজের।"

"কী করে? ফুলের নাম নিয়ে তো ভিতরে এলাম, যদি মনে না ধরে, তখন?"

"তখন ?" ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি টেনে এনে বললে, "চেট্টিবাবুর কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে চলে যাবেন।"

"চলে যাব ?"

"হ্যাঁ।" বলতে বলতেই খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, "কিন্তু কেউ চলে যায় না।"

"আবার গিয়ে অন্য ফুলের নাম করে বুঝি ?"

"না। সেটা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ," মেয়েটি বললে, "আসল কথা হচ্ছে কী জানেন ? এই বাড়িতে আমরা থাকি নটি মেয়ে, নটি ফুলের নটি নাম,—আমাদের দেখে কারুরই অপছন্দ হবার কথা নয়। এ হচ্ছে সবার থেকে সেরা বাড়ি, এর নিয়মকানুনও তাই ভিন্ন।"

তারপরেই মুচকি একটু হেসে বলে উঠল, "কেন, অপছন্দ হয়েছে নাকি আমাকে ? চোখ দেখে তো তা মনে হয় না।"

"না না, তা নয়, আমার তোমাকে—"

খিলখিল করে হেসে উঠল, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, "আমার নামটি মনে আছে তো, চম্পা, চাঁপাফুল। একটা হিন্দী কথা শুনুন। 'চম্পামে হৈ তিন গুণ, রূপ রস ঔর বাস।' কেমন, আমার মধ্যে আছে তো ?"

"কী আছে ?"

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল, "রূপ, রস ঔর বাস ?"

মোহাবিষ্টের মত বলে উঠলাম, "আছে।"

"মগর এক হৈ অবগুণ—কী বলুন তো ? কী আছে দোষ চাঁপাফুলের মধ্যে ?"

"জানি না।"

বললে, "ভ্রমর না আওয়ে পাশ। চাঁপার কাছে কখনও ভ্রমর আসে না।"

নিশ্চুপে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তা লক্ষ্য করে আবার কৌতুকে কেঁপে উঠল দুটি চোখের তারা, বললে, "কী, দেখছেন কী ? আমি সত্যিকারের চম্পা, না, মিথ্যে চম্পা, তাই ?"

তারপরেই হেসে উঠে, "সে সব দেখবেন পরে। আগে আসুন তো?"

"কোথায়?"

হাতটা ধরে বললে, "এই আসনে।"

নেহাতই একটা কৌতূহল। এগিয়ে গিয়ে বসলাম ওর সেই লাল পশমের আসনটির উপরে। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে হেঁট হয়ে বসে দুটি হাতে আমার পা থেকে খুলে নিল জুতো, এক পাশে সরিয়ে রেখে বললে, "মোজাও খুলতে হবে।"

"খুলছি।"

"না না, আপনি নয়," পায়ে হাত দিয়ে বললে, "আমাকে খুলতে দিন।"

বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা আর না করে ছোট্ট হাফ-মোজায় হাত দিল সে, বলতে লাগল, "প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা জগৎ আছে, সে জগতের নিয়মকানুন অন্তত তাকে মানতে দিন।"

তারপরে একটা ভিজে হলদে রঙের গামছা এনে বেশ করে মুছিয়ে দিল আমার পা হাত আর মুখ। গামছাটা শুধু হলদে রঙের নয়, কাঁচা হলুদ বেটে মাখিয়েও রাখা হয়েছিল তাতে। বললাম, "এও কি নিয়মের মধ্যে নাকি?"

হাসি-হাসি মুখেই বললে, "হ্যাঁ।"

তারপরে একটা ধবধবে সাদা তোয়ালে হাতে এনে দিয়ে বললে, "এবার নিজের হাতে মুখটুখ মুছে ফেলুন।"

ততক্ষণে ভিতরের জানলা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার কপাট দুটোও টেনে দিয়েছে সে।

আমি উঠে এসে খাটটার উপরে বালিশ টেনে কাত হয়ে বসে পড়ে বললাম, "যাই বল, এ সবের কোনও অর্থ হয় না।"

কাছে এসে বসেছে ততক্ষণে হাঁটু মুড়ে, বললে, "কী সবের অর্থ?"

"এই সব বরণ-টরন আর কী!"

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "হয় অর্থ। যদি আরও মেশেন আমাদের সঙ্গে, তা হলে নিজেই একদিন বুঝতে পারবেন।"

একটু হেসে ওর হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, "তুমি বলই না শুনি?"

ও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দু হাতে ধরল আমার রঙিন টাইটা, বললে, "কী বলব? আপনি তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন।"

"তা হোক, তুমি বল।"

চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, বললে, "আমার আত্মার প্রতীক ওই বরণডালার প্রদীপশিখাটি। আমার যে বিশুদ্ধ আত্মা, যাকে কোন মালিন্যই কখনও স্পর্শ করে না, সে আপনাকে বরণ করে নিল, বললে—হে পথিক, এস।"

"দূর! এও অর্থহীন। আত্মা বরণ করবে কেন? শুনেছি, অবশ্য এ সব সংস্কার যাঁরা মানেন তাঁদের কাছেই শুনেছি, ওভাবে বরণ করে মাত্র মেয়েরা। তুমি মেয়ে হয়েই পুরুষকে করছ, এটা তোমাদের লৌকিক আচার, এর মধ্যে আবার আত্মার কথাকে টেনে আনা কেন?"

মেয়েটি ধীর স্থির দৃঢ় কণ্ঠেই বললে, "না, লৌকিক আচার শুধু নয়, এর মধ্যে একটা তত্ত্ব আছে। আত্মার স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নেই, কিন্তু তিনি যখন স্ত্রী-শরীরে বিরাজ করছেন, তখন তিনি স্ত্রী-ভাবেই ভাবিত। আর ওই যে ঘট দিয়ে বরণ করলাম, ঘট হচ্ছে আধার, এই দেহ-লাবণির প্রতীক।"

কণ্ঠে বোধ হয় একটু শ্লেষই ফুটে উঠল, বললাম, "আর ওই জল-ছিটানো?"

বোধ হয় বুঝল আমার মনের ভাব, আর বুঝল বলেই একটা বেদনার ম্লানিমা ভেসে গেল ওর মুখের উপর দিয়ে। কিন্তু তবু বললে, "আমার দেহ-মনের উচ্ছ্বসিত যে প্রীতি, বারিবিন্দু তারই প্রতীক। আমাকে বিশ্বাস করবেন কি করবেন না, সে আপনার উপরে নির্ভর করছে। কিন্তু আমাকে আমার বিশ্বাস থেকে টলাবেন কী করে?"

গলার টাইটা খুলে ওর হাতে দিলাম, বললাম, "না না, সে কথা বলতে আমি চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, ওসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করেও তো আপন বিশ্বাসকে অটল রাখা যেতে পারে।"

"পারে না।"—মেয়েটি উঠে টাইটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে আবার ফিরে এসে কাছ ঘেঁষে বসল তেমনি করে। বললে, "ভাবকে প্রকাশ করতে গেলে যেমন ভাষা চাই, অন্তরের স্থির বিশ্বাস বা চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে গেলেও তেমনি কতকগুলি বাহ্যিক আচার-আচরণ চাই।"

"কিন্তু, নাই বা করলে প্রকাশ? প্রকাশ যে করতেই হবে, এমন কী কথা আছে?"

"আছে। প্রকাশ না করলে নিজেরই বা বিশ্বাস জন্মাবে কী করে নিজের উপর? সব থেকে বড় কথা, অভ্যাসের দাস হলেও যন্ত্র হতে পারি নি, আমরা মানুষই আছি। তাই সব-কিছুর জন্যই যেমন একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমাদেরও তেমনি নিজেকে প্রস্তুত করবার একটা অবকাশ দিতে হবে।"

"পাও না কি সে অবকাশ?"

বোধ হয় কোনও অজ্ঞাত ব্যথার তারেই রিন রিন করে বেজে উঠল গিয়ে আমার কথা। মুখ নিচু করে স্তব্ধ হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে কেমন যেন কাঁপা বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "যা পাই সে আর কতটুকু?"

চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, "থাক্ এ সব কথা।"

"থাক্।" বলে আবার তেমনি হাসি-হাসি মুখখানা তুলেই তাকাল আমার দিকে।

বললে, "এবার আমি যাই?"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়েই বললাম, "কোথায়?"

দুষ্টুমি-ভরা চাপা একটা হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ, বললে,

"যাই। আপনি একটু বিশ্রাম করুন ততক্ষণ। আমি এখুনি ফিরে আসছি। কেমন?"

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভেবে নিজেই অবাক হচ্ছিলাম মনে মনে। নিরস, নিছক কাজ-পাগল মানুষ আমি একটি। যাকে বলে সোজা কথায়—কাঠখোট্টা। বিবাহিত নই, সংসারীও নই আমি ঠিক, এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না। পান্থলুর কথায় হঠাৎই রাজী হয়ে খেয়ালের বশে এসেছিলাম। কিন্তু এমনভাবে যে এত সময়ের অর্থহীন অপব্যয় করে যাব, এ আমার নিজেরও ধারণা ছিল না। এসেছিলাম নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, অথচ ঠিক এখন চলে যেতেও চাইছে না মন। ঝিরঝিরে ওই যে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছে শিয়রের জানলাটি দিয়ে, উত্তপ্ত শিরে এসে লাগছে সেই বিহ্বল বাতাস, প্রচুর যেন আরাম ওর মধ্যে, প্রচুর যেন শ্রান্তির অপনোদন।

বোধ হয় মিনিট পনরো-কুড়ির মধ্যেই ফিরে এল সে। সঙ্গে ঝিয়ের মত একটি বুড়ী, তার হাতে একটা ঝকঝকে পিতলের থালা, শালপাতায় ঢাকা। আমার বিমূঢ় বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে থালাটা নামিয়ে রাখল সেই লাল পশমের আসনের সামনে। ওর নিজের হাতে ছিল ঝকঝকে একটা জলের গ্লাস। যথাস্থানে সেটি রেখে ঝিটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল আবার, বললে, "আসুন।"

আমি ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝতে পেরে উঠে বসেছি একেবারে, বললাম, "এ আবার কী?"

সস্মিত মুখে হাত দুটো ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে বলে উঠলো, "খাবার।"

ওর বেশবাসেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ময়ূরকণ্ঠিটা বদলে লাল একটা সাধারণ শাড়ি পরে এসেছে সে, বাহু কটিদেশ আর কণ্ঠের ফুলের মালাও নেই, লম্বমান বেণীটা বুকের পাশ দিয়ে সামনে টেনে আনা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "খাব কী! হোটেলে ফিরে যাব যে।"

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠল, "না।"

"না কী!"

আমার হাত দুটো ধরে বলতে লাগল, "না। খেতে হবে আজ আমার কাছে।"

"কেন?"

কৌতুকে উজ্জ্বল তখনও দুটি আঁখিতারা, বললে, "নিয়ম।"

আর বাক্যব্যয় করে লাভ নেই বুঝে বসলাম গিয়ে খাবারের সামনে। পিতলের থালায় শুভ্র ভাত, আর ছোট ছোট বহু বাটি রয়েছে সাজানো চারপাশে। একটা পাখা হাতে নিয়ে বসল আমার কাছ ঘেঁষে। বললে, "খাওয়া কিন্তু একেবারে নিরামিষ। কারণ আমরা আমিষ খাই না।"

তারপরই মুচকি একটু হাসল। বললে, "তবে জানি আপনারও নিরামিষে কোনও অসুবিধা হবে না।"

তখনও চলেছে আমার উত্তরোত্তর অবাক হবার পালা: "অসুবিধা হবে না মানে! কী করে তুমি জানলে?"

মিটিমিটি তখনও হাসছে, বললে, "জেনেছি।"

"কিন্তু কেমন করে? তুমি জান আমি কোথাকার লোক?"

তখনও বিদ্যুতের ঝিলিমিলি ওর চোখে, বললে, "ভারতবর্ষের লোক তো বটে!"

একটু থেমে তারপর বললাম, "তাতে কী বোঝায়?"

"যেটুকু বোঝায় তাতে অন্তত এটুকু জানি, অসুবিধা হবার কথা নয়।"

মনে মনে যে চমৎকৃত হয় নি—এ কথা বলতে পারি না। আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাস্তবিকই কোনও ঝামেলা নেই, যে কোনও সাধারণ খাদ্যই আমি তৃপ্তির সঙ্গে খাই, আমিষ বা নিরামিষ—কোনও কিছুর প্রতিই বিশেষ কোন আসক্তি নেই। কিন্তু সে সংবাদ জানতে পারল কী করে এই মেয়েটি!

"কই! খান।"

"হ্যাঁ, খাচ্ছি।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার দিকে যে ওর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

এক সময় বললে, "অবাক হচ্ছেন, না?"

মুখ তুলে বললাম, "হ্যাঁ, তা একটু হচ্ছি।"

বললে, "আপনার চোখের গভীর দৃষ্টি, মুখের গড়ন, ললাটের উন্নতি, ভ্রূভঙ্গির সরলতা—এসব দেখে বেশ বোঝা যায়, সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোক আপনি আসলে।"

"মানে?"

"খাওয়া শেষ করুন। বলছি সব। আর-কিছু এনে দেব?"

"না।"

কর্মব্যপদেশে নানান জায়গায় ঘুরেছি, নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু ঠিক এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয় নি।

বাথরুমটা ছিল কাছেই, বারান্দার কোণে। ঘুরে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম, দু-তিনটি মেয়ে উঠনটার সেই দোলনার কাছে বসে তখনও গল্প করছে। একটা বন্ধ ঘর থেকে নাচের শব্দ আসছে ভেসে। অন্য কোনও বন্ধ দরজার অন্তরাল থেকে গান।

ঘরে ফিরে এসে বসতেই দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ততক্ষণে সেই লাল আসনের সামনের জায়গাটা আগের মতই আবার পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে সম্ভবত সেই বুড়ী ঝিটি। আলোটা আরও একটু কমিয়ে দিয়ে ও এসে বসল বিছানায়। বললে, "গরম হচ্ছে, না?"

"না। বেশ হাওয়া দিয়েছে তো।"

"তা বটে। ভিজে-ভিজে হাওয়া। বৃষ্টি নামবে। কিন্তু তা হোক, শার্টটা আপনি খুলে ফেলুন।"

একটু হেসে শার্টটা খুলে ওর হাতে দিতেই আলনায় রেখে এল

সেটা, আর হাতের ঘড়িটি খুলে রেখে দিল তাকের উপরে। বললাম, "সর্বনাশ, সাড়ে আটটা যে বেজে গেছে!"

"বাজুক।"

"বেশী দেরি করা হবে না, বড় জোর সাড়ে নটা।"

মুখ টিপে একটু হেসে চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

আমি ততক্ষণে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। ও ঠিক আগের মতই কাছে এসে বসেছে হাঁটু মুড়ে। আমার হাতের উপর হাতখানা রেখে বলে উঠল, "রাত্রে আপনার ফিরে যাওয়া হবে না।"

হেসে বললাম, "এটাও নিয়ম নাকি?"

তেমনি হেসেই বললে, "তা বলে সন্ধ্যারাত্রেই যে ফিরে যাবেন, এও নিয়ম নয়।"

ওর হাতখানা টেনে নিলাম বুকের উপর, বললাম, "দু-তিনটি মেয়ে দেখলাম এখনও উঠনে বসে। ওদের কোন বন্ধু নেই নাকি?"

"বন্ধু! আমারও কি বন্ধু আছে নাকি?"

হাতখানা বুকের উপর চেপে ধরে বলে উঠলাম, "আমি কী?"

খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, "ও, তাই বলুন। ওদের বন্ধু হয়তো এখনও আসে নি।"

"হয়তো আসবেও না কেউ।"

"না। আসবে নিশ্চয়ই। চেট্টিবাবু আমাদের সকালেই সব শুনিয়ে দেয় কিনা।"

বললাম, "একটু রাত হলেও আসা চলে তা হলে?"

"ওমা, তা কেন চলবে না?"

বলে উঠলাম, "তবে আমার বেলা এটা কী হল? আমাকে বলা হয়েছিল কেন, 'গোধূলি-লগ্নে আসবেন আপনি।' ঠিক যেন বিয়ে করতে আসছি।"

হেসে উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে, বললে, "বিয়ে ছাড়া আর কী! অন্তত আমাদের জীবনে তো বটেই।"

বোধ হয় মেয়েটি একটু ভাবপ্রবণ, বলতে বলতে হঠাৎই আমার

বুকের উপর রাখল ওর মুখ, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, "আমাদের বাড়িতে প্রথম কিনা আপনি আজ, তাই গোধূলি-লগ্নে আপনার আবাহন।"

"তাই নিয়ম বুঝি?"

মাথা তুলে আমার মুখের কাছে নিয়ে এল মুখ, ছু হাতে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "বিয়েই আমার আজ।"

কৃষ্ণকলির মত সেই স্ফুরিত অধরের আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। আমার প্রমত্ততায় ও বোধ হয় বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল প্রথমে, তারপরে শিথিল হয়ে গেল ওর বাহুলতা, আমার বুকের উপরে মুখখানা রেখে সেইভাবেই পড়ে রইল বহুক্ষণ। কৌতুকের স্বরেই বলে উঠলাম, "কী? বলেছিলে না চম্পা, ভ্রমর না আওয়ে পাশ? ভ্রমর তো এল।"

আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, "আমি তো আর সত্যিকারের চম্পা নই, ওরা রেখেছে এই নাম, তার আমি কী করব?"

"কী নাম তোমার সত্যিকারের?"

মুখ তুলে তাকাল, বললে, "বলা বারণ।"

"তবে থাক্। আমারও অত শিরঃপীড়া নেই নাম নিয়ে।"

আবার ছু হাতে আমার কণ্ঠদেশ সেইভাবে আকর্ষণ করে বললে, "নেই বুঝি?"

"না, নেই। তুমি—তুমি। এই-ই যথেষ্ট।"

এবার বুঝি প্রমত্ততা জাগল ওর নিজের মধ্যে, প্রথমে মৃছু, তারপরে প্রতিদানের লীলা গভীরভাবেই মুদ্রিত করে দিল আমার অধরপ্রান্তে। অস্ফুট কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, "তুমি—তুমি—তুমি।"

বাইরে তখন মেঘের গুরুগর্জন শোনা যাচ্ছে, বিছ্যুৎ চমকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কোন এক ঘর থেকে উদাত্ত পুরুষকণ্ঠের সঙ্গীত আসছে ভেসে, দক্ষিণী গীত নয়, প্রমত্ত মল্লার-রাগের বিস্তার হিন্দী বর্ণ-বিন্যাসকে কেন্দ্র করে—পাবস-ঋতু আঈ ছুলহন মনভায়ে।

একবার চকিত হয়ে সেই উদাত্ত উদার কণ্ঠস্বর যেন কান পেতে

শুনল চম্পা, তারপরে আবার এলিয়ে দিল নিজেকে আমার বাহু-উপাধানে।

ক্রমে ক্রমে সত্যই নামল একসময় বৃষ্টি, পাহাড়-থেকে-নেমে-আসা নিবিড় মেঘপুঞ্জ আর ঝরোঝরো বর্ষণ। বললাম, "বৃষ্টির ছাট আসছে। ওঠ। জানলা বন্ধ করে দাও।"

আবেশজড়িত কণ্ঠে বললে, "না।"

"না কী! দেখছ না মুখে চোখে এসে লাগছে বৃষ্টির ছাট!"

মুখখানা আরও এগিয়ে দিল জানলার দিকে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণা জমতে লাগল ওর মুখমণ্ডলে। ওরই শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম ওর মুখ। তারপরে নিজেই উঠে হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলাম আমাদের শিয়রের জানলাটা।

বললাম, "ওঠ। ওদিককার জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এস। বৃষ্টির জল এসে তোমার ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিল যে!"

"দিক।"

"দমকা হাওয়ায় দেবমূর্তির সামনেকার দীপটা যে নিবে গেছে তা জান?"

"যাক।"

"এবার দেয়ালের আলোটাও বাতাস লেগে নিবু-নিবু করছে যে!"

"করুক।"

একমুহূর্ত থেমে তারপরে বললাম, "তা হলে আমাকেই উঠতে হল দেখছি।"

"না না।" চম্পা তাড়াতাড়ি বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, আমিই বন্ধ করছি।"

বলে উঠতে গিয়েও সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়ল না, হাত বাড়িয়ে আমার চোখ দুটো চাপা দিল করপল্লবে। তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, "দুষ্টু!"

তারপরেই জোর করে আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে থাক, খবরদার, এদিকে ফেরাবে না মুখ।"

বলে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সবার আগে নিবিয়ে দিল দেয়ালের আলোটা। অন্ধকারের অবগাহনে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেও জানলার কাছে গিয়ে যখন বন্ধ করছিল ও জানলার পাল্লা দুটো, তখন সেই *জানলা-দিয়ে-ঠিকরে*-আসা আবছা আলোর মায়াকে অস্বীকার করবে কী করে?

তারপর? বাইরে চলতে লাগল উন্মত্ত ঝঞ্ঝা আর প্রবল বারিবর্ষণ। তারই শব্দে ডুবে গেল সেই পুরুষকণ্ঠের উদাত্ত স্বর, হারিয়ে গেল কোন নৃত্যরতা রূপসীর নূপুরনিক্কণ। আর হারিয়ে গেলাম আমরা—অন্ধকারের অবগুণ্ঠনতলে দুটি ভীরু প্রাণী।

অনেক—অনেক পরে যখন বৃষ্টির ধারা বাইরে হয়ে গেছে সরল, সেই প্রবল বারিপাতের শব্দও গেছে কমে, ও ধীরে ধীরে উঠে বসল, লক্ষ্য করলাম, বেশ-বাস বিন্যস্ত করে সেই অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম বারান্দায়, কয়েকটি মেয়েকণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে দুটো একটা পুরুষকণ্ঠও। কয়েকটা নামও যেন কানে এল—এ যখন ওকে ডেকে কথা বলছিল, সেই অবকাশে। চাপা ঈষৎ একটা উত্তেজনার আভাস প্রত্যেকেরই কণ্ঠে।

একটা নাম পেলাম জয়ালক্ষ্মী, আর-একটা নাম ভামতী, অন্য নাম ভারাহালু। সবই মেয়েলী নাম, এটুকু জানতাম। কিন্তু এ সব নাম থাকতে ফুলের নামে নাম রেখেছে কেন এভাবে?

একটু পরেই ও এল ঘরে ফিরে। আস্তে আস্তে বন্ধ করল দরজাটা। তারপরে কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে আবার জ্বেলে দিল প্রদীপটা, তারপরে ফিরে এল আমার কাছে। বললে, "ঘুম পাচ্ছে না?"

"না।"

বললে, "আমারও না। জান, আমাদের বাগানের বড় একটা গাছ ঝড়ে পড়ে গেছে। চেট্টিবাবু ছাতামাথায় লোক নিয়ে দেখতে গেল।"

"এই রাত্রে! লোকটি কি পাগল নাকি?"

"কে, চেট্টিবাবু? এ বাড়ি আর বাগানের প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের উপরেই ওর সমান মায়া। সবই যে ওর নিজের হাতের। অন্য বাড়ি-গুলির অনেক-কিছু ও সহ্য করে, কিন্তু এ-বাড়ির একটু এদিক-ওদিক কিছু হলে ও সইবে না।"

"আরও বাড়ি আছে নাকি?"

"আছে বই কি! তবে সেগুলো অন্য রকম।"

"কী রকম?"

দুটি চোখ তিরস্কারে হয়ে উঠল গভীর, বললে, "হ্যাঁ, এখন আমি ওঁকে সব ব্যাখ্যা করতে বসি আর কী!"

"করলেই বা!"

দৃষ্টি আরও কঠোর করতে গিয়েও হেসে ফেলল, বললে, "অতশত বুঝি না, তবে অন্য বাড়িতে এই ফুলের নামে নাম রাখার ব্যাপার-ট্যাপার নেই।"

বললাম, "যাকগে। তুমি ঘুমবে না?"

"না," একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "এমন বর্ষা নামলে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম নামতে চায় না।"

তারপরেই মুখখানা আমার মুখের কাছে এনে বললে, "আর-জন্মে বোধ হয় ময়ূরী ছিলাম।"

চুপ করে রইলাম। ঘুম আমারও আসছে না বটে, কিন্তু সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে একটা তন্দ্রার ঘোর যেন অবশ করে রেখেছে আমাকে।

হঠাৎই অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখতে পেলাম ওর চোখে, ভারি স্নিগ্ধ আর কোমল সেই দৃষ্টিভঙ্গি, বললে, "ঠিক লোভী পুরুষ বলতে যা বোঝায়, তা তুমি নও।"

ভয়ানক চমকে উঠলাম এ কথায়, বললাম, "তার মানে?"

বললে, "এসব শখ তোমার দু দিনের। আসলে কৌতূহলটাই তোমার কাছে বড়—কী আছে রহস্য, সব ভেদ করব, সব জানব, সব দেখব।"

একটু হেসেই উঠলাম এবারে, বললাম, "আমাকে এরই মধ্যে খুব চিনে ফেলেছ বুঝি ?"

"যদি বলি, হ্যাঁ ?"

"বাজে কথা।"

"না," দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "সাত্ত্বিকতা তোমার মজ্জায় মজ্জায়। রাজসিক আর তামসিক ভাব যেটা তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে, সেটা সাময়িক।"

ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম, "এ কথা কজনকে বলেছ এভাবে ?"

যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখ, কিছুক্ষণ একটি কথাও পারল না বলতে। বাঁকা একটু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনের মতন কথা কইতে শেখাটাকে ওরা বোধ হয় আর্টের মত রপ্ত করে নিয়েছে। বৃষ্টি যদি না নামত, তা হলে যত রাত্রিই হযে থাকুক, ঠিক বাড়ি ফিবে যেতাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ওর করস্পর্শ অনুভব করলাম আমার কপোলদেশে।

বললে, "শোন।"

"কী ?"

"এ দিকে ফের।"

ফিরলাম। বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ, অনেক কিছুই শিখে রাখতে হয় আমাদের। মনোরঞ্জনের সব রকম উপায়ই আমাদের করায়ত্ত থাকা চাই। মনোরঞ্জন তোমার করতে পেরেছি নিশ্চয় ?"

ওর হাতখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, "তা পেরেছ। এখন ঘুমোও দেখি।"

"না।"

বলে হঠাৎই দু হাতের মধ্যে টেনে নিল আমার মুখ, বললে, "আশ্চর্য দুটি চোখের দৃষ্টি তোমার। পুরুষের দৃষ্টি এ নয়।"

হেসে উঠলাম, "তবে কি মেয়ের ?"

"হেসো না। সত্যি বলছি, এক এক সময় অদ্ভুত এক ধরনের দৃষ্টি

ফুটে ওঠে তোমার চোখে, যা মেয়ের তো নয়ই, পুরুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিও নয়।"

আশ্চর্য হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর: "কী, বলতে চাও কী তুমি?"

স্বপ্নভরা মোহময় যেন ওর কণ্ঠস্বর, যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছে ও, বললে, "সাত্ত্বিক ধরনের পুরুষ জীবনে আমার এই প্রথম।"

বিরক্ত হয়ে গেলাম এবারে, বললাম, "আচ্ছা পাগল তো তুমি! আমি এবার কিন্তু ঘুমোব।"

হঠাৎই আবার মুখ নিচু করে কী যেন গভীরভাবে দেখতে লাগল আমার মুখে। বললাম, "আরে, দেখছ কী অমন করে?"

কী অদ্ভুত, হঠাৎই ওর দু চোখের কোণে টলমল করে উঠল দুটি মুক্তাবিন্দুব মত দু ফোঁটা অশ্রু। আঙুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না, আয়ত-চোখের কোণের অশ্রুবিন্দুও যে কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারে, এর আগে কখনও তা জানতাম না, অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, "বাঃ!"

মুক্তা দুটি ভেঙে দুটি ধারা নেমে এল কজ্জলরেখা ভেদ করে দুটি কোমল কপোলতলে।

ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে, আমার দিকে চাইতে চাইতে কী এক আশ্চর্য অব্যক্ত আনন্দে ভরে গেল মুখ। দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মতই হঠাৎ ওর উদ্ভাসিত উত্তপ্ত অধররেখা স্পর্শ করলে আমার ওষ্ঠদেশ।

বললে, "আর লুকোতে পারবে না নিজেকে আমার কাছ থেকে।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "এ আবার কী কথা?"

তেমনি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত কণ্ঠেই বলে উঠল, "তুমি কবি—কবি তুমি।"

ততক্ষণে উঠে বসেছি বিছানায়। মনে মনে ভাবছি, মেয়েটার মাথারও গোলমাল আছে নাকি একটু?

ও আমার দুটি হাত ধরে বলে উঠল, "বল, ঠিক বলেছি কি না?"

অসীম বিরক্তিতে প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম: "তা আর বলবে না! অপূর্ব তোমার আবিষ্কার! সারাজীবন ল্যাবরেটারি, ফেরিক অক্সাইড আর কার্বন ডায়ক্সাইড, কপার আর কপার অ্যালয়—এ সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরলাম।"

আমি থামতেই ও বলে উঠল, "ওসব কী ইংরেজী কথা বলে গেলে তুমি!"

এবার বিরক্তি পরিণত হয়েছে প্রায় দুর্দান্ত ক্রোধে, সব ভুলে একেবারে খাঁটি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলায় বলে উঠলাম, "তোমার গুষ্টির মাথা! একজন কাটখোট্টা লোক, তামা পিতল লোহা এই সব নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে উনি আবিষ্কার করে ফেললেন একেবারে কবিকে! আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কবি নেই, তা জান?"

ও অবাক হয়ে শুনছিল এ অপরূপ ভাষাবিন্যাস, একসময় বলে উঠল, "তুমি বাঙালী, না?"

সর্বনাশ! থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর ভাষাতেই বলে উঠলাম, "দূর! কে বললে তোমাকে?"

বললে, "একবার মাসখানেক সীমাচলমের মন্দিরে গিয়ে থেকে-ছিলাম। সেখানে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। তাঁরা তিন দিন ছিলেন, আমাদেরই বাসার এক দিকের অংশে থাকতেন, বৈষ্ণব। ঠিক তাদেরই মত ভাষা বললে কি না তুমি।"

বললাম, "তুমি বুঝতে পার নি। আসলে আমি উৎকল দেশের লোক।"

"যাঃ!" অবিশ্বাসীর সুরে বললে, "তাদের ভাষা কিছু কিছু আমি জানি। বাজে কথা বোল না, তুমি নিশ্চয়ই বাঙালী।"

কণ্ঠ একটু উচ্চে তুলে বললাম, "বাঙালী তো বাঙালী, তাতে হয়েছে কী?"

"কিছুই হয় নি," বললে, "কিন্তু তুমি কবি নও?"

"না।"

কী ভেবে যেন আর-কিছু বলল না, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানার এক ধারে।

রাত বোধ হয় তখন শেষ প্রান্তে, ঘুমটা হঠাৎ গেল ভেঙে। শিয়রের কাছে জানলাটা বুঝি এক সময় খুলে দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, বৃষ্টি কখন থেমে গেছে, মেঘ গেছে কখন কেটে, আকাশ পরিষ্কার, দিগন্তের তীরে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একমনে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে খেলা করছে ওর আঁচলপ্রান্ত নিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছে বটে খাটের একটা ধার ঘেঁষে, কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখি দুটি চোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুধারা শুকিয়ে আছে। বড় মায়া লাগল দেখতে দেখতে।

উঠে বসলাম। জানলার কাছে বসে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। শুকতারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্ফুট আলোর ছটা বিস্ফুরিত হয়ে গেল পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সেই আলো ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল, থমথমে বৃক্ষশাখায় পাখিদের ঘুম ভাঙল—উড়ে-যাওয়া টিয়া-চন্দনার ঝাঁকই বেশী। কে আমি, কোথায় বসে আছি, সব ভুলে গিয়ে মনটা অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। এই দেহযন্ত্রটা যেন বীণাযন্ত্র, কোন অদৃশ্য বীণকার এসে মুহূর্তে আমাকে বাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ও-ও কখন জেগে উঠেছিল কে জানে! এক সময় কী মনে হতেই চমকে তাকিয়ে দেখি, আমার পাশটিতে বসে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখেই বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। প্রস্তুত হতে কতক্ষণই বা লাগল! ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে চারিদিকে। মুখচোখ ধুতে বাইরে যখন এসেছিলাম, দেখেছিলাম সব দরজাই বন্ধ, শুধু বাইরে যাবার সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা খোলা। দূর থেকেই চেট্টিবাবুকে দেখা যায়। ধূপ জ্বালিয়ে নটি মূর্তির পায়ে রাখছে নটি ধূপ। টাইটা গলায় লাগিয়ে ওর কাছে এলাম, বললাম, "যাই।"

তেমনি প্রস্তরমূর্তির মতই বসে আছে। একবারও ওঠে নি বা

আলনা থেকে নিয়ে আমার শার্ট-টাইটাও এগিয়ে দেয় নি। বললাম, "এই পাঁচটা টাকা রাখ। তোমাকেই দিলাম।"

শুধু অবাক হওয়াই নয়, বড় ব্যথাতুর মনে হল সেই দৃষ্টি। বললে, "এ কেন ?"

"রাখ।"

"কেন ?"

"এমনি। কিছু কিনে নিও আমার নাম করে।"

বললে, "আর আসবে না, না ?"

একটু হাসলাম শুধু উত্তরে, কিছু বললাম না, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

চেট্টিবাবুর পরনে সেই পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। এরই মধ্যে তার স্নান সারা হয়ে গেছে মনে হল। সূর্যমূর্তির পায়ে একটি রক্তকরবী ফুল রাখতে রাখতে বলে উঠল, "চললেন বাবুজী ?"

"হ্যাঁ।"

"আজ আসছেন তো রাত্রে ?"

"না।"

দ্রুত সরে এলাম, সদর দরজা খুলে পড়লাম গিয়ে একেবারে পথে। একটি জানলা যে খোলা থাকবেই, তা আমার জানা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও কর্তব্য মনে করলাম না। করেই বা লাভ হত কী ? ম্যাঙ্গানিজ 'ওর' খোঁড়া হয়েছে যেখানে, সেখানে যেতে হবে আমাকে একটু পরেই। প্রচুর কাজ আজ হাতে।

বোধ হয় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম দুটো দিন কাজ নিয়ে। হেড অফিসে চিঠি লেখা, ম্যাঙ্গানিজের নতুন স্যাম্পল নিয়ে পার্সেল করে পাঠানো, ম্যাঙ্গানিজের খনির মধ্যে নেমে নিজের চোখে স্তর পরীক্ষা করা। পাম্বলু বললে, "কী ব্যাপার বাবু, আপনি কি এক মাসের কাজ এক দিনে শেষ করতে চান ?"

"তা করতে পারলে খুবই খুশী হতাম পাপ্পুলু, কিন্তু পারছি কই ?"

ঘনশ্যামদাসবাবু হেসে হেসে বললেন, "এখানে কি আর মন টিকছে না বাবুজীর ?"

"তা নয়, তবে কাজটাও তো করতে হবে।"

"জরুর জরুর।" ঘনশ্যামদাসজী বললেন, "আমি বলছি কী, আপনাকে আরও কিছুদিন আমার কাছে আটকে রাখব। ম্যাঙ্গানিজের দুটো 'কোয়ারি' তো আপনি দেখেছেন আমার। আমি বলি কী, আপনি আরও থোড়া বহুৎ 'প্রসৃপেক্টিং' করুন। ভাল পারসেণ্টের ম্যাঙ্গানিজ যদি পাওয়া যায় তো, বাস্, আপনার ওই 'ভাইজাগ' পোর্ট আমাদের।"

হেসে বললাম, "এ তো মহৎ প্রস্তাব। আপনি আমাদের এজেন্ট, আমাদের হেড অফিসে এই মর্মে একখানা চিঠি দিন, তার কপিটা দিন আমাকে, বাস্, 'প্রেসৃপেক্টিং শুরু করি।"

"বহুৎ আচ্ছা।" ঘনশ্যামদাসজী বললেন, "অনেক খাটতে হবে আপনাকে বাবুজী, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে হবে, পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরতে হবে।"

"তাতে আমার খুবই উৎসাহ। বলুন না, আজই বেরিয়ে পড়ি।"

খুশী হয়ে হাসতে লাগলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন, "আপনাকে যতদিন আটকে রাখতে পারি, ততই আমার লাভ বাবুজী। আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেব।"

"তা নিন।"

হাসলেন ঘনশ্যামজী, তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠলেন, "বাবুজী, দেবীপল্লী কেমন লাগল ?"

"দেবীপল্লী ! মানে ?"

"সে-সন্ধ্যায় যেখানে গিয়েছিলেন ওটাকে আমরা দেবীপল্লী বলি।"

হঠাৎই এই বিষয়ের কথা ওঠায় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, বলাই বাহুল্য। ঘনশ্যামদাসজী কিন্তু রসিক লোক, বললেন,

"নওজোয়ান আপনারা, তার ওপর বিয়েসাদী করেন নি, একটু ফুর্তিটুর্তি না করলে চলে ! তা ছাড়া, এই বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বতে ওটাই হচ্ছে এখানকার একমাত্র রোশনাই।"

বললাম, "কিন্তু 'দেবীপল্লী' নাম কেন ?"

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, "যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওটাই সেরা বাড়ি। ওখানেই 'দেবী'রা থাকেন।"

"দেবী কেন ?"

বললেন, "সেই ছেলেবেলায় ওদের দেবতার সঙ্গে বিয়ে হয় কিনা, সেইজন্য দেবী বলে ওদের।"

কোনক্রমে উচ্ছ্বসিত হাসিকে রোধ করে সংক্ষেপে বললাম, "ও।"

তারপরে কয়েকটা দিন ধরে সত্যি-সত্যিই চলল প্রসপেক্টিং। সারাটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়ে খেটে-খুটে এসে শুয়ে পড়তাম একেবারে মৃতের মতো। ঘুম আর ঘুম।

এক-একদিন মনটা যেন হঠাৎ বিবশ হয়ে যেত। আয়নায় নিজেই নিজের চোখ দেখতাম ভাল করে। আমার চোখে কবির দৃষ্টি ? হো-হো করে হেসে উঠতাম আপন মনে। কবি কাকে বলে ? ছুটি চরণ মিলিয়ে ছন্দ কস্মিনকালেও রচনা করেছি বলে মনে পড়ে না।

'প্রসপেক্টিং' করতে যেতাম সেই বিরাট হুমড়ি-খাওয়া পাহাড়টা পেরিয়ে। পাহাড়টির সানুদেশে, যেখান থেকে উঠেছে বিশাল অরণ্যানী বুকে করে আর-একটি পাহাড়। এই সানুদেশের শোভা জীবনে কখনও ভুলব না। দু দিকের দুই পর্বতশীর্ষ বেয়ে শুভ্র মেঘপুঞ্জ আসে নেমে, কোথা থেকে যেন স্ফটিকের মতো ধারায় ধারায় নেমে আসে উপলমুখরা ছোট একটি ঝরনা। বিরাটকায় খয়েরী একটা পাথরের ওপরে এক ঝাঁক পরীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত কল্লোলে সেই ঝরনার একটি ধারা, দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

কুলিরা এসে ডাকে, "বাবু!"

পান্থলু আপন উৎসাহেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সে বলে, "বাবুজী, যাবেন না? এগুবেন না আর?"

"না। আর-একটু বিশ্রাম করতে দাও ওদের।"

ওরা সবাই মিলে জটলা করে একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের তলায়, আর আমি বসে থাকি চুপচাপ একটা পাথরের ওপরে ওই অপরূপ ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে। এ কী অপূর্ব প্রাণ-কলরোল! বিপুল এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, চোখের কোণ ওঠে ভিজে।

কাজের ক্ষতি হয় বইকি। যা আমার জীবনে কখনও হয় নি, তাই হতে থাকে। এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ওই ঝরনার ধারে বসে।

পান্থলু এসে হয়তো পিছন থেকে ডাকে, "বাবুজী, যেখানে শাবল চালাতে বলেছিলেন সেখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এসে দেখবেন কি একটু?"

"আঃ!" বলে উঠি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে, "তুমিই দেখে নাও না। আর উঠতে পারি না আমি।"

আমার এ অভাবিত বিরক্তিতে অবাক হয়েই পান্থলু চলে যেতে থাকে।

হঠাৎ মনে হয়, আরে, তাই তো! হয়েছে কী আমার!

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে হাঁকডাক শুরু করে বলি, "পান্থলু, দাঁড়াও। আমি নিজে না দেখলে হবে না।"

হয়তো কুলিদের হাত থেকে প্রচণ্ড উৎসাহে নিজেই টেনে নিই শাবলটা, একদমে বেশ খানিকটা খুঁড়ে ফেলে তারপরে শ্রান্তিতে হাঁপাতে থাকি।

ঘনশ্যামবাবুর ছুটো 'কোয়ারি'র 'ওর' থেকে পাঠানো স্যাম্পলের বিবরণ এসেছে। খুবই আশাপ্রদ। অতএব তাঁর খুশির আর সীমা নেই।

রাত্রে হোটেলে আহার্য-গ্রহণের সময় পাম্বলু বলে ওঠে, "আপনার কী হয়েছে, বাবুজী?"

"কী?"

"আমাদের মত নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন যে!"

"মানে?"

হাসল পাম্বলু, বললে, "এই যে হোটেলে খাচ্ছেন, কদিন ধরেই তো দেখছি, মাছ-মাংস একেবারেই অর্ডার দিচ্ছেন না!"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "আরে, দূর। দাঁড়াও, আজ একটু মাছ খাব। এই বয়!"

কিন্তু বয় এসে জানাল, অর্ডার নেই বলে মাছ তো সে বাবুজীব জন্য রাখে নি, মাংসও না।

মনের মধ্যে কিন্তু একটা খুশির অন্তঃস্রোতই বয়ে গেল, অথচ বাইরে কপট বিরক্তি প্রকাশ করেই চেঁচিয়ে উঠলাম, "রাবিশ! কালই ছেড়ে দেব এ হোটেলে খাওয়া।"

অথচ রাত্রে একাকী বিছানায় শুয়ে কী এক অব্যক্ত বেদনার আবেগে যেন ছটফট করতে থাকি। নিষুতি রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চুপিচুপি চোরের মতন উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে আয়নাটা টেনে নিই,—আশ্চর্য, কী দৃষ্টি আমার মধ্যে দেখেছিল ওই মেয়েটি?

চিন্তাটা যেন তীরের মতন গেঁথে গেল আমার মনের মধ্যে। টেনেও ফেলতে পারছি না, থেকেও যন্ত্রণার অবধি নেই! আমি কবি! অর্থ কী 'কবি' শব্দের?

হঠাৎ দপ করে আলোর মতো জ্বলে উঠল মনে একটা কথা। যারা চরণ মিলিয়ে ছন্দ রচনা করে, তারাই কি মাত্র কবি? না, অন্য কোনও অর্থ করেছে ওই মেয়েটি 'কবি' শব্দটির।

পরদিন সকালে পাম্বলুকে পাঠালাম ডেকে, নীচের ঘর থেকে উপরে। বললাম, "আজ ছুটি নিচ্ছি।"

"বেশ তো। আমি কুলিদের বলে দিই অন্য কাজে যাক ওরা।"

"যাক।"

আবার পাস্থলু ফিরে এসে কাছে দাঁড়াতেই বললাম তাকে মনের ইচ্ছাটা খুলে। রীতিমত খুশী দেখাল পাস্থলুকে, বললে, "এতে এত 'কিন্তু' কেন বাবুজী? আপনি সেই একদিন গিয়ে আর তো—"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "ছেড়ে দাও সেসব কথা। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল।"

পাস্থলু বললে, "বেশ তো। আপনাকে যেতে হবে না, আমিই চেট্টিবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলে আসছি।"

"টাকাটা?"

"দিন।"

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে এল পাস্থলু। বললে, "সব বন্দোবস্ত করে এলাম বাবুজী।"

"আচ্ছা।"

সন্ধ্যার পরই গিয়েছিলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই গেল খুলে। চেট্টিবাবু হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললে, "আসুন বাবুজী, অনেক দিন আসেন নি, আমি ভাবলাম, চলেই বা গেলেন বুঝি।"

"না। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর?"

হেসে বললে, "ভালই আছি বাবুজী। খবর সব ভাল।"

তেমনি নটি মূর্তির পায়ের কাছে নটি ধূপ জ্বলছে, চারিদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে হাসিমুখেই বললাম, "আজও কি ফুলের নাম বলতে হবে?"

বিনীত ভঙ্গিতে বললে, "সেটাই তো নিয়ম।"

বললাম, "ফুলের নাম যা বলব তা তো আপনার জানাই। চাঁপা ফুল।"

"ও, আচ্ছা!" বলে আমাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে উঠনে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলেন, "চম্পা!"

দেখা গেল মেয়েটিকে। বারান্দার একটা থামের কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে, আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না তাকে ভাল করে। চেট্টিবাবু সেই দিকে নির্দেশ করে বললেন, "যান বাবুজী। আপনি তো আর নতুন নন।"

ঘরটা কি ও বদল করেছে? ঘরে ঢুকে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। সেই খাট, সেই রকমই আসন একখানা পাতা। সেই রকমই বিষ্ণুমূর্তি একটি কুলুঙ্গিতে। কিন্তু সব সেই রকম হয়েও যেন ঠিক সেই রকমটি নয়।

আমার দিকে একবারও তাকায় নি চম্পা, আমিও দেখতে পাই নি ওর মুখ, আমার দিকে পিছন ফিরে ঘরখানা দেখিয়ে দিয়েই ও চলে গিয়েছিল। আবার সেই রকম জানলার বাইরে ছুটি একটি মুখ, একটু চুড়ির রিনিঝিনি। আবার সেই রকম ছুটি মেয়ের ওকে নববধূর মতন ছু দিকে ধরে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া।

মুখ নিচু করে একটি মোড়ার উপর বসে ছিলাম। সঙ্গের মেয়ে ছুটি অপসৃত হতেই মনে হল, এইবার বুঝি হবে সেই রকম বরণের পালা।

কিন্তু, তা কিছু হল না, বরণের ডালাও নামিয়ে রাখল না আমার পায়ের কাছে। মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই হতবাক্ হয়ে গেলাম সুকঠিন বিস্ময়ে।

কোনও ডালা নেই ওর হাতে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার সামনে নীলাম্বরী একটি শাড়ি পরে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে চম্পা নয়, অন্য একটি মেয়ে।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। মেয়েটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুঠাম দেহভঙ্গি, সুশ্রী মুখ,—সম্ভবত সুন্দরীর পর্যায়েই ফেলা চলে।

বললাম, "তুমি কে? চম্পা কোথায়?"

মেয়েটি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমিই চম্পা।"

"না না, তুমি কেন হবে? চম্পা, মানে, সে—মানে—"

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলাম, "কজন চম্পা আছে এখানে ?"

"কেন ! একজন। আমিই তো।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম, "না না, তোমাকে আমি চাই না। আমি চাই—"

কথা শেষ না করেই বলে উঠলাম, "যাচ্ছি আমি চেট্টিবাবুর কাছে।"

মেয়েটিকে অবাক করে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলাম চেট্টিবাবুর ঘরে।

আর-কেউ ছিল না অবশ্য ঘরে সৌভাগ্যবশত। সোজা হয়ে বসে ছিল চুপচাপ দুটি চোখ বন্ধ করে। ডাকলাম, "চেট্টিবাবু !"

"উঁ ? কে ?"

"আমি।"

"ও বাবুজী !" আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, "কী ব্যাপার বাবু ?"

রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম, "যাকে খুঁজছিলাম ও তো সে নয়।"

আশ্চর্য হয়ে বললে, "কাকে খুঁজছিলেন ?"

বললাম, "সেদিনকার সেই মেয়েটি—চম্পা।"

একটু যেন ভেবে কী মনে করতে চেষ্টা করল, বললে, "আপনি যেন সেই কবে এসেছিলেন ? তারিখটা মনে আছে বাবুজী ?"

"আছে।"

বললাম তারিখটা। সেই খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে কী যেন দেখতে লাগল চেট্টিবাবু। একটা পৃষ্ঠা দেখে পাতা উল্‌টে অপর এক পৃষ্ঠায় এল সে, কী দেখে বলে উঠল, "বাবুজী, তাকে তো আজ পাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু আমি এসে তো তাকেই খুঁজেছিলাম প্রথমে।"

আমার দিকে তাকিয়ে ভারি স্নিগ্ধ ভঙ্গিমায় হাসল চেট্টিবাবু; বললে, "আপনি বসুন বাবুজী।"

বসলাম।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "তার নাম তো চম্পা নয়।"

"সে কী! তবে যে সেদিন—"

বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আপনি এখানকার কিছু শোনেন নি দেখছি। ওর নাম আজ হচ্ছে রজনীগন্ধা।"

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ওর বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে, তারপরে বলে উঠলাম, "ফুলের নামে বুঝি নাম রাখা হয় মেয়েদের?"

"হ্যাঁ বাবুজী, দেবতা সাক্ষী করে এই নামকরণ।"

"রোজই রাখা হয়?"

"হ্যাঁ, রোজই। সে আমাদের একটা প্রক্রিয়া আছে। যে যে ফুল পাওয়া যায় বাগান থেকে, সেই সেই ফুলে নাম রাখা হয় মেয়েদের এবং এ নিয়মটা ওরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে থাকে।"

একটুক্ষণ থেমে তারপর বললাম, "ধরুন, আমি এসে এমন ফুলেব নাম করলাম, যে নাম সেদিন কোনও মেয়েরই রাখা হয় নি, তখন?"

"হ্যাঁ, সে রকমটাও ঘটে। তখন আপনাকে বলব আর-একটা ফুলের নাম করতে।"

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বলে উঠলাম, "কিন্তু কেন এ নিয়ম?"

একটু হাসল চেট্টিবাবু, বললে, "আমাদের কথা আপনি জানতে চান বাবুজী?"

"হ্যাঁ, তা চাই।"

"কী লাভ?"

"এমনি। কৌতূহল।"

"বেশ। আপনাব কৌতূহল একদিন মিটবেই বাবুজী। তবে কিছু অপেক্ষা করুন।"

"কেন?"

একটু হেসে বললে তেমনি ধীর কণ্ঠে, "অধৈর্য হবেন না। ওটা কোন কাজের কথা নয়।"

নিশ্চুপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপরে বললাম, "আচ্ছা, সেই মেয়েটির দেখা কি আর পাওয়া যাবে না?"

তেমনি টুকরো হাসি ওর মুখে, বললে, "সেটা খানিকটা আপনার

ভাগ্য, আমরা কিছু বলতে পারব না বা নির্দেশ দিতে পারব না, এই নবগ্রহমূর্তির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

পর পর নটি মূর্তির পায়ের কাছেই পড়ে আছে ফুল, পুড়ছে ধূপ। বললাম, "আচ্ছা চেট্টিবাবু!"

"বলুন?"

"আমি যদি আজকের চম্পার কাছে না যাই?"

একটা কালো ছায়া খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে: "যাবেন না?"

"না।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, "তা হলে মেয়েটির একটু ক্ষতি হবে বাবুজী।"

"ক্ষতি কেন? না না, ও-টাকা আমি ফেরত চাই না।"

চেট্টিবাবু বলে উঠল, "না বাবুজী, ধর্মত ও-টাকা তা হলে আমরা নিতে পারি না। বললাম তো আমরা ভয়ানক নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ।"

"কিন্তু কে করেছে এ নিয়ম?"

একটু হেসে বললে, "ধরুন, আমরা।"

"তা হলে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেই বা দোষ কী?"

"না," চেট্টিবাবু গম্ভীর স্বরে বললে, "এখানকার সব-কিছুই এই নবগ্রহকে সাক্ষী করে, এর ব্যতিক্রম কিছু করতে কেউ পারবে না।"

শুনতে শুনতে হঠাৎই আমার একটি কথা জেগে উঠল মনে। মনে হল, আমাকেই বা এত ভাবালুতায় পেয়ে বসেছে কেন? না হয় আজকের এই চম্পার সঙ্গেই আলাপ করে আসি। কে সেই এক-দিনের মেয়েটি, যার জন্য এত ব্যাকুলতা! চেট্টিবাবুই বা মনে করছে কী!

বললাম, "ঠিক আছে। এই চম্পার কাছেই যাব। সত্যি কথা বলতে কী, যে কোনও চম্পাই আমাদের কাছে সমান।"

যেন একটা পাষাণের ভার নেমে গেল চেট্টিবাবুর বুক থেকে, বলে উঠল, "এইবারই ঠিক কথা বলেছেন বাবুজী। এসব জায়গায়

একজনের মনের সঙ্গে মন বাঁধলে দুঃখ পেতে হয়। আপনি দেখুন গিয়ে, আমাদের সব মেয়েই সমান। সবাইকে সমান শিক্ষা দিই আমরা। লক্ষণ দেখে, অনেক বেছেই আমরা ওদের রাখি এই বাড়িতে।”

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। একটা পরীক্ষা করতে হবে। সেদিনকার চম্পা যা যা করেছিল, এও তাই করবে, হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তি করবে। হয়তো এও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে, তুমি কবি।

সঙ্গে সঙ্গেই চেনা হয়ে যাবে এই নিপুণিকাদের।

একপা এগিয়েও ফিরে এলাম, বললাম, “আচ্ছা চেট্টিবাবু, সেদিন সেই মেয়েটি বরণডালা হাতে আমাকে বরণ করেছিল, এ তা করল না কেন?”

বলল, “এ বাড়িতে সে যে ছিল আপনার প্রথম দিন। প্রথম দিনে প্রথম যে মেয়েটি আপনার কাছে আসবে, সে-ই সবার হয়ে বরণ করে নেবে আপনাকে।”

“এর অর্থ কী চেট্টিবাবু?”

“সব-কিছুর অর্থই হচ্ছে এক। কিন্তু সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আপনার কিছু বিলম্ব হবে বাবুজী। আপনাকে অনেক দেখতে হবে, অনেক কিছু বুঝে নিতে হবে।”

আর কোনও কথা না বলে সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই লক্ষ্য করলাম, অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে সেই মেয়েটি, সেই নতুন চম্পা।

তার কাছে আসতেই চলতে আরম্ভ করল সে।

তার ঘরে এসে প্রথমে বসতে গিয়েছিলাম খাটের ওপর। কিন্তু পরক্ষণে সেই পূর্বেকার আচরণ মনে পড়তেই এগিয়ে গিয়ে বসলাম মেঝেতে, পাতা আসনটির উপরে।

সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল আমার সব-কিছু। বললে, “আসনে গিয়ে বসলেন কেন?”

"বাঃ রে! তোমাদের সেই নিয়ম। আজ অবশ্য মোজা-জুতো নেই, তবে সেই হলুদ-বাটা দিয়ে—"

কথা শেষ হতে না-হতেই খিল খিল করে হেসে উঠল সে, মুখে আঁচল দিয়ে বলে উঠল, "পেল্লী?"

'পেল্লী' মানে, বিয়ে। বললাম, "বিয়ে! বিয়ে কেন?"

বললে, "চেট্টিবাবু যে বললেন, আপনি নতুন নন। আমাদের হয়ে একজন তো আপনাকে বিয়ে করে নিয়েছে। তবে আবার কেন? আসুন, খাটের ওপর উঠে আসুন।"

বলে উঠলাম, "সর্বনাশ! সেদিন ছিল তবে আমার বিয়ে! খাবার-দাবারও আজ হবে না বুঝি?"

এবার আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এল কাছে, বললে, "খিদে পেয়েছে বুঝি? খাবেন? রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসব?"

বুঝলাম ব্যাপারটা। উঠে দাঁড়িয়ে খাটের দিকে যেতে যেতে বললাম, "না। হোটেলে গিয়েই খাব। সেদিন সে মেয়েটি খাইয়েছিল কিনা, তাই ভেবেছিলাম, ওটাও নিয়ম বুঝি।"

একটু হেসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বসল মেয়েটি, দুটি চোখ আমার চোখে স্থাপিত করে বললে, "গান শুনবে?"

"গান? জান তুমি?"

"জানি। হিন্দী গানও শিখছি, দুটি-একটি গাইতে পারি। শুনবে?"

"না। আচ্ছা, নাচতে পার?"

"হ্যাঁ।" বলতে বলতে সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, বললে, "শুধু একবার চেট্টিবাবুকে বলতে হবে।"

"না।"

"তবে?"

বললাম, "তুমি বস। তোমার সঙ্গে শুধু গল্প করব।"

মেয়েটি বুঝি একটু ক্ষুন্ন হল, ধীরে ধীরে বসল এসে কাছে। তেমনি হাঁটু মুড়ে, আমার কোলের কাছটিতে।

বললাম, "আচ্ছা, তোমরা কি সবাই নাচ গান জান ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই মেয়েটিও জানত ?"

"কোন্ মেয়েটি ?"

"সেই যে আমার প্রথম রাত্রির মেয়েটি ?"

একটু থেমে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, বললে, "কে সে জানি না। তবে জানে সে নিশ্চয়ই।"

বললাম, "কেমন লাগছে আমাকে ?"

একটু থেমে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, "ভাল।"

আমি বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছি তখন। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি, তারপর এক সময়ে বললে, "জামাটা খুলে রাখবে না ?"

"রাখছি।"

জামাটা খুলে ওর হাতে দিতেই সে আগের চম্পার মতই জামাটা রেখে এল আলনায়। তারপর আবার আমার কাছে এসে হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগল, "আমাকে কেমন লাগল বললে না তো ?"

"ভাল, খুব ভাল।"

বলতে বলতে হাত দুটি ধরে তাকে টেনে নিলাম আরও কাছে, সে কী ভেবে আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল, "ছাড়। আমি এখুনি আসছি।"

চলে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল শাড়িটা বদলে অন্য একটা সাধারণ শাড়ি পরে। ঠিক সেই আগের চম্পার মতই। তবে এর মুখে বোধ হয় পান। আমার হাতেও একটি পান দিল এনে। বললে, "খাও।"

তারপরে আবার তেমনি করেই কাছ ঘেঁষে এসে বসল। আমার একখানি হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে, "কোন্ দেশের লোক গো তুমি ?"

"নাই বা শুনলে ?"

মুখ টিপে একটু হাসল, বললে, "আচ্ছা।"

যতই লাস্যভাব থাক্ এর মধ্যে, যতই নিপুণা হোক্ ও কথাবার্তায়, আমার কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিতৃষ্ণাই জাগছে ওর প্রতি। অথচ স্বাস্থ্যসম্পদের দিক থেকে আগেরটির থেকে এ চম্পাই হয়তো আকর্ষণীয়া বেশী। কথা বলছি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটা বেদনার রাগিণী রিন রিন করে বেজে চলেছে অনুক্ষণ।

বললাম, "কী দেখছ অমন করে ?"

ঠোঁটের কোণে চটুল হাসি টেনে এনে বললে, "তোমাকে।"

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ টিপ টিপ করে উঠল এই সময়, বললাম, "আচ্ছা চম্পা, বল তো আমার চোখ দুটো কেমন ?"

"ভাল।"

"কী রকম ভাল ?"

"বেশ একটা ভাব আছে।"

"আমি কী, বল তো ? আমি কী রকম লোক ? কী প্রকৃতির ?"

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তারপরে একটু ভেবে বললে, "ভাল লোক।"

"আর কিছু বলতে পারলে না তো ?"

"আর কী বলব ? কী শুনতে চাও ?"

বলে উঠলাম, "আচ্ছা, আমার চোখ দেখে কী মনে হয় ? আমি কি কবি ?"

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ, বললে, "তাই নাকি ! তুমি কবি ?"

"তুমি বলতে পারলে না তো ?"

"বাঃ রে, আমি কী করে বলব ?"

উঠে বসেছি ততক্ষণে। বললাম, "আমি সত্যিই কবি। ছন্দ মিলিয়ে কাব্য লিখি।"

দাক্ষিণাত্যে কবির সম্মান বোধ হয় বেশী, নইলে 'কবি' কথাটা

শোনামাত্রই আনন্দে এ-রকম হাততালি দিয়ে উঠত না অন্য কেউ। বললাম, "জামাটা দাও তো ?"

"ও মা, কেন ?"

"কবিদের অমত কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই।"

উঠে গিয়ে জামাটা এনে দিল, ওটা পরে নিয়ে বললাম, "লক্ষ্মী মেয়েটি, কবির কোনও কাজে বাধা দিও না, এখন যদি তুমি বাধা দাও, আমি একটি লাইনও লিখতে পারব না।"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম।

ও বললে, "এ কী ! চললে নাকি ?"

ওর হাত দুটি ধরে বলে উঠলাম, "মাথায় কবিতা এসে গেছে একটা, না লিখলে হারিয়ে যাবে।"

বললে, "আমি কাগজ কলম এনে দিচ্ছি, এখানে বসে লেখ না।"

"তা কী হয় ?" বলে উঠলাম, "বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার নিজেব সেই খাতাটায় লিখতে হবে। নইলে—। সে তুমি বুঝবে না। কবিদের ব্যাপারই আলাদা।"

বিস্মিত বিমূঢ় মেয়েটিকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সেদিনও হিন্দী গানের তান তুলেছে কোনও এক পুরুষকণ্ঠ—পিয়া গয়ো পরদেশ।

আর অন্য ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে নূপুরের ঝঙ্কার, ঠিক সেই সেদিনকার মতো।

চেট্টি বলে উঠল আমাকে দেখে, "এরই মধ্যে চললেন বাবুজী ?"

সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটি বসে আছে ওর কাছে, দুটি-একটি বই এদিক ওদিক ছড়ানো। একবার তার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠলাম, "হ্যাঁ। আপনি কালকের টাকাটা রাখুন। কালও আসব।"

বিনীত ভঙ্গিমাতেই বলে উঠল, "আসছেন যখন, কাল রাত্রে ওটা দিলেই হত।"

"না, নিন। আছে যখন কাছে।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাড়িটা পার হয়ে যেতে যেতে আপনিই আজ চোখ পড়ল সেই জানলাটির দিকে। সেই প্রথম দিনকার ঘর। জানলাটি কিন্তু খোলা ছিল না, ছিল বন্ধ করা।

পরদিন ভোরে হেঁটে-হেঁটে একাই গিয়েছিলাম পর্বতের ওপরে। ওদের শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে ধরে পার হলাম পর্বত, ধীরে ধীরে নেমে গেলাম সেই অপরূপ ঝরনাটির কাছে। বসলাম গিয়ে আমার সেই প্রিয় পাথরটির ওপরে।

বহুক্ষণ কেটে গেল। কত কী এলোমেলো চিন্তার ঝড় উঠতে লাগল মনে। একসময় উঠে বসলাম, হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ঘনশ্যাম-দাসবাবুর 'কোয়ারি'তে। কিছুক্ষণ কাজকর্ম করে ফিরে এলাম বাড়ি।

হায় রে মিথ্যার তোরণ, আমার জীবনের একটা কোণেও কাব্য-রচনার ইতিকথা লুকিয়ে নেই।

রাত্রে সকাল-সকাল খাওয়া শেষ করেই গেলাম চেট্টিবাবুর ওখানে। দেখি, সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটি এসে বসেছে সবে, হাতে তার ইকনমিক্সের বই ; বললাম, "পড় নাকি ?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বললে, "হ্যাঁ, প্রাইভেটে।"

তারপরেই আমাদের কথা বলবার অবকাশ দিয়ে চলে গেল বাইরে। বললাম, "বলব ফুলের নাম ?"

"বলুন।"

"জুঁইফুল।"

একটু হেসে বললেন, "আজ ও-নাম কারুরই রাখা হয় নি।"

"তা হলে গোলাপ।"

তেমনি হেসেই বললেন, "অন্য নাম করুন বাবুজী।"

বললাম, "পদ্ম।"

এবারও অন্য নাম করতে হল।

"বেলকুঁড়ি।"

"হয়েছে। আসুন।"

গেলাম। না, সে নয়। এও অন্য এক মেয়ে। যে-দুটি মেয়ে একে ঘরে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল, তাদের মধ্যে একজন কি সে? একবার যেন মনে হল তার মুখের হাসি দেখে। কিন্তু মুহূর্তের দেখাতেই সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হওয়া গেল না।

মেয়েটিকে যখন এটা-ওটা কথা বলতে দিয়ে ওর হাতটা টেনে আকর্ষণ করলাম নিজের দিকে, তখন সেই আগের দুটির মতই উঠে দাঁড়াল, বললে, "আসছি।"

এলো আগের মেয়েদের মত শাড়ি বদলে। তেমনি খাটের ওপর এসে বসা, তেমনি জামা খুলে আলনায় রাখবার অনুরোধ, তেমনি হাতের ওপর হাত রাখা, তেমনি পান খাওয়ানো। দেখলাম মেয়েটিকে ভাল করে। এর কেশরাশি বেণীবদ্ধ নয়, খোলা কোঁকড়ানো চুলের রাশি মেঘের মত পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। একটু ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কিন্তু ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, বয়স অপেক্ষাকৃত কম, মুখ-চোখ বুদ্ধি-দীপ্ত, রীতিমত সুন্দরী বলা চলে মেয়েটিকে। এরও দুটি হাত ধরে প্রশ্ন করলাম, "আমার চোখ দুটো দেখতে কেমন?"

"সুন্দর!"

"আমাকে কি দেখে মনে হয়, আমি কবি?"

শোনামাত্র হেসে উঠল খিলখিল করে, বললে, "ও বুঝেছি।"

"কী?"

"কাল একটি মেয়ের ঘরে আপনি কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন না?"

"কে বললে তোমাকে?"

"আমি শুনেছি।"

"তোমাদের মধ্যে এসব আলোচনা হয়, না?"

"ও মা, হবে না?"

"বেশ, এবারে বল তো, আমাকে কবি বলে মনে হয়?"

একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকাল, তারপরে বললে, "বাঃ রে! দেখে কি তা বলা যায় না কি? আর তা ছাড়া, এর মধ্যে মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে? আপনি কবি নিজেই তো বলেছেন।"

"না।" তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম, "মিথ্যে কথা বলেছি মেয়েটিকে।"

অবাক হয়ে বললে, "কেন?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

"বুঝব না কেন?"

"সবাই সব কথা বুঝতে পারে না।"

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "চলি।"

"সে কী! চললেন কেন?"

একটু হেসে বললাম, "রাত হয়ে গেল না?"

"ওমা, তাতে কী? না হয় ভোরেই যাবেন।"

"না। এই তো অনেকক্ষণ গল্প করলাম।"

বললে, "শুধু কি গল্প করতেই এসেছিলেন? না হয় গানই শুনে যান।"

"না।"

আমি তখনও দরজার দিকে চলেছি দেখে বলে উঠল, "শুনুন।"

ফিরে দাঁড়ালাম: "কী?"

"নাচ দেখবেন? নাচতেও পারি।"

অল্প একটু হেসে বললাম, "না।"

মেয়েটি অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। চেট্টিবাবুর ঘরে আসতেই ও যথারীতি বললে, "চললেন বাবুজী?"

"হ্যাঁ। এই নিন টাকা, কালকের।"

পিছনের দরজা বন্ধ করে বাইরের পথে নেমে দেখি, আবার বর্ষণের আয়োজন চলেছে দিগন্তে। আবার সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের আনাগোনা। যেতে যেতে আজও ফিরে তাকালাম সেই জানলার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে

সমস্ত রক্ত যেন সঞ্চালিত হল হৃদ্‌পিণ্ডে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি, জানলায় দাঁড়িয়ে একটি ছায়ামূর্তি। ভাল করে দেখা যায় না মুখ অন্ধকারে। কিন্তু আমি কাছাকাছি আসতেই তার একটি বাহু আন্দোলিত হয়ে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি ডাকছে আমাকে।

কিন্তু না। কী একটা যেন ছুঁড়ে দিল আমার পায়ের কাছে। পরক্ষণেই জানলা থেকে অদৃশ্য হল ছায়ামূর্তি।

মুখ নিচু করে পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখলাম, একটা দোমড়ানো কাগজ। তাড়াতাড়ি সেটা হাতে তুলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে এলাম বাড়ি।

আলোর সামনে কাগজটা ভাল করে মেলে পড়ে দেখলাম, খুব তাড়াতাড়িতে জড়ানো অক্ষরে লিখেছে। সবটা না বুঝলেও, বার কতক পড়বার পর ভাবটা বুঝলাম। 'শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বেজে উঠবে, সেই ঘণ্টার শব্দ শোনবার পর মন্দিরের পাশে যে ঝিলটা আছে, সেখানে যেও। আমার সঙ্গে দেখা হবে না, হওয়া উচিত নয়, দেখবে, ঝিলের সংলগ্ন যে বাগানটা আছে, তার কোণে আছে বুড়ো একটা বেলগাছ। সেই বেলগাছের পায়ের কাছে থাকবে একরাশ ফুল। সেই ফুল চিনে নিও। তার এদেশী নাম না জানলে কারুব কাছ থেকে জেনে নিও সেই নাম। সন্ধ্যায় সেই নামই হবে আমার। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলো।'

যেন সেতারের তারের মত বেজে উঠল বুকের ভিতরটা। চিঠিটা পাগলের মত চেপে ধরলাম ঠোঁটের উপরে। তারপর, অনেক রাত্রে টুকরো টুকরো করে ফেললাম সেই লিপি। মনে মনে ভাবলাম, এ আবার কী প্রমত্ততায় পেয়ে বসল আমাকে!

সকালে আবার হাঁকডাক করে শুরু করলাম কাজ।

মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা হয় এগারোটায়। আর কী হবে ওই ঘণ্টার শব্দ শুনেই বা! আজ তো যাবই চেট্টিবাবুর ওখানে। নাম করব

যে-কোনও একটা ফুলের। যে কোনও মেয়েই হোক না বক্ষলগ্ন, আসে-যাবে না তাতে কিছুই। নিজের মনে মনেই বলতে লাগলাম,

'হাত পেতে নাও সামনে যা পাও
বাকির খাতা থাক্ বাকি,
লাভ কী শুনে দূরের বীণা
মাঝখানে তার সব ফাঁকি।'

নিজের কানে কথাগুলি যেতেই চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। লোহা-তামার যে ব্যাপারী, তার মুখে আবার কাব্য কেন? আর কারই বা রচনা এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যের? নিজের মনকেই যেন উত্তর দিল আমার আর-একটি মন, 'ওমর খৈয়াম'। বুকের পাষাণ ভার যেন নেমে গেল। নিজে যদি কোনক্রমে কিছু রচনা করে ফেলি, তা হলে সত্যি হবে সেই মেয়েটির কথা, কিন্তু মিথ্যা হবে আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধ্যানধারণা সব-কিছু। তা হলে নিজেকেই আমি আর ক্ষমা করতে পারব না।

পর্বতের সানুদেশে 'প্রসপেক্টিং' করতে করতে হঠাৎ এক সময় কানে এল দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। শোনামাত্র কী হল আমার মধ্যে, কে জানে? পান্থলুকে বললাম, "বাস্, আজ আর নয়, ছুটি।"

বলে দ্রুত পায়ে প্রায় ছুটতেই শুরু করলাম মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে। ঢং—ঢং—ঢং। বেজে চলেছে ঘণ্টা, আর মনের মধ্যে যেন অশ্রুত এক সঙ্গীত বাজতে লাগল, 'আসি—আসি—আসি'। পথ-বিপথ কিছুই ছিল না লক্ষ্যে, শুধু মনে একটিমাত্র কথা, আমাকে পৌঁছতেই হবে গিয়ে।

ঝিলের কাছে পৌঁছলাম যখন, মনে হল পড়েই বুঝি যাব মাথা ঘুরে। কিন্তু না, দম হারালে চলবে না, কোথায় সেই বুড়ো বেলগাছটি?

বেশী খুঁজতে হল না, মন্দিরের চতুঃসীমা-নির্দেশক ভাঙা প্রাচীরের প্রায় গা ঘেঁষেই একটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন বেলগাছটি।

ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই তখন, শুধু দূরে ঝিলের বাঁধানো ঘাটে দু-তিনটি মেয়ে স্নান করছে।

সত্যিই পড়ে আছে বৃক্ষমূলে একমুঠো ফুল, ডালশুদ্ধ কয়েকগুচ্ছ রক্তকরবী। তুলে নিলাম হাতে কিছু ফুল। বাসায় ফিরে আসছি, আর পথ হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এগুলো মাত্র ফুল নয়, যেন কার বুক-নিংড়ানো কয়েক ফোঁটা রক্ত।

ঘনশ্যামদাসজী গদিতেই ছিলেন, আমার সাড়া পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "কী বাবুজী, কাম হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ, আজকের মত শেষ।"

"বাস্, বাস্। এবার দুপুরটা লম্বা বিশ্রাম নিন।"

"দেখা যাক।"

ঘনশ্যামদাসজী ততক্ষণে আমার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়েছেন, নিম্নকণ্ঠে বললেন, "বাবুজী, বড় বিপদ হয়েছে।"

"বিপদ!"

"হ্যাঁ, আমার ছেলে, মানে সেই কালেজে-পড়া নওজোযান আব কী, একখানা খত লিখেছে কী, ও এখানে আসবে। কিন্তু কী করে আসবে বলুন তো বাবুজী?"

"কেন?"

বললেন, "আমার এখানে যে বউ আছে, ওরা তো তা জানে না।"

"বেশ তো, না হয় জেনেই গেল, তাতে হয়েছে কী?"

"না, তাতে কিছু হয় নি। কিন্তু এখানকাব কথা তো ওকে জানানো চলবে না বাবুজী।"

"কেন চলবে না?"

ঘনশ্যামদাসবাবু প্রায় ফিসফিস করেই বললেন, "আমার এখানকাব বউ এদেশী আছে জানেন তো? জওয়ানী ভী আছে। 'পঢ়িলিখি' নওজোয়ান ছেলের সামনে তাকে কী করে বার করি, বলুন তো? লজ্জাটা হচ্ছে সেইখানেই।"

হেসে বললাম, "সত্যি করে বলুন তো আপনার ভয় হচ্ছে কী নিয়ে?"

"আরে রাম-রাম!" ঘনশ্যামদাসবাবু বললেন, "ভয়ের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে মনের শরম নিয়ে। এই কথাই ভাবছি। আচ্ছা, আপনি যান, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন, আমি ভেবে দেখি, কী করা যায়!"

উপরে উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। কতক্ষণে ঘড়ির কাঁটাটা সরে যাবে, কতক্ষণে বিকাল হয়ে আসবে?

পরনে আজ ধুতি-পাঞ্জাবি, সন্ধ্যা হতে না-হতেই বেরিয়ে পড়লাম চেট্টিবাবুর উদ্দেশে। মনে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও আছে, যদি আমার আগে কেউ গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বসে রক্তকরবী ফুল!

চেট্টিবাবু ফুলের নাম শুনে, খেরো-বাঁধানো খাতাটির সঙ্গে কী যেন মিলিয়ে নিলেন। তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, "যান বাবুজী ভিতরে।"

গেলাম। ওর দরজার সামনে বারান্দার যে থামটা, সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও। সিল্কের গোলাপী শাড়ি পরেছে, বেণীমূলে রক্তকরবী-গাঁথা একটা মালা জড়ানো। আমাকে যেন পথ দেখিয়েই নিয়ে গেল ওর ঘরে। ভিতরে যেতেই কপাট দিল বন্ধ করে, তারপর দুটি চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে, তারপরে সেই অস্ফুট বীণা-ঝঙ্কারের মতই বলে উঠল, "সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি কাকে বলে জান?"

মাথা নেড়ে জানালাম, "না।"

বললে, "এই হচ্ছে সেই লোক যাকে আমি চাই—দেখামাত্রই যখন এই কথা মনে হয়, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি।"

এগিয়ে এসে দুটি হাতে লতার মত বেষ্টন করে ধরল আমাকে। বললে, "ওদের কথা শুনেই বুঝেছিলাম, এ তুমি ছাড়া আর-কেউ নয়। হ্যাঁ গো, ওদের বুঝি তোমার ভাল লাগে নি?"

কণ্ঠে জোর এনে বললাম, "দূর! কে বললে ভাল লাগে নি?"

"তবে, পালিয়ে যেতে কেন?"

"কী মুশকিল, পালালাম কোথায়?"

"পালাও নি? ওদের কাছে সব শুনেছি।"

বললাম, "তোঁমাদের জীবনকে জানবার জন্য একটা কৌতূহল। যতটা জেনেছি, তাতেই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছি।"

মুখ টিপে একটু হেসে বললে, "আমাকে খুঁজে বেড়াও নি?"

"না। কে বললে তোমাকে?"

"কে আবার বলবে? আমি বলছি। যেভাবে আগ্রহভবে আমার চিঠি কুড়িয়ে নিলে পথ থেকে, তা যে দেখেছে, তার কী বুঝতে কিছু বাকী থাকে! আর ব্যাকুল হয়ে আমার এই জানলাটাব দিকে তাকানো?"

"কে দেখেছে তা?"

বললে, "এই পোড়া চোখ।"

বললাম, "এক হিসেবে কথাটা সত্যি, তোমাকে খুঁজছিলাম বটে।"

কথাটা শুনে আনন্দেব শিহবণ লেগে যেন কেঁপে উঠল ওব সর্বশরীর, বললে, "এস, বসবে এস স্থির হয়ে।"

সেদিনের মতই জামাটা খুলিযে নিয়ে রেখে এল আলনায। সেদিনের মতই আমাকে বিছানায় এলিয়ে পড়তে দেখে খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসল হাঁটু মুড়ে, বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "আমার জন্য কষ্ট হত?"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় বললাম, "দূর। কষ্ট আবার কী? তবে, তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল।"

"কী রকম?"

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলাম, "আমি কবি নাকি?"

ছুটি করপল্লবের মধ্যে টেনে নিল আমার মুখখানা, বললে, "সন্দেহ আছে নাকি?"

বললাম, "একটা প্রশ্ন করব। 'কবি' বলতে তুমি কী বোঝ? যিনি ছন্দ মিলিয়ে কাব্য রচনা করেন?"

"যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনিও কবি হতে পারেন।"

"যথা?"

বললে, "তাঁর সৃষ্টি করা এই অপরূপ বিশ্বজগতের অন্তর্লীন সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করবার মত যার চোখ আছে,—আমার মতে, তিনিই কবি। রচনা করুন আর নাই করুন, মনটা তাঁর কবি-মন।"

অত্যন্ত অবাক হয়ে উঠে বসেছি ততক্ষণে, বললাম, "কে তুমি! এমন করে বুঝবার মত চোখই বা তুমি কোথায় পেলে, মনই বা তুমি কোথায় পেলে?"

সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটি চোখ ভরে উঠল জলে, বললে, "ওসব জানি না, তুমি শুধু বল, আমার অনুমান মিথ্যা নয়।"

কিন্তু এর উত্তর দেওয়া যে আমার পক্ষে কত কঠিন, তা কি ও জানত? ছোট থেকেই প্রকৃতি আমায় টানে, পশু-পক্ষীর জীবনলীলার বৈচিত্র্য আমার কৌতূহল উদ্রেক করে, ভাব-পাগল বিচিত্র এক ব্যক্তি ছিলাম আমি শৈশবে। এই সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া, অনুভূতি ও ভাবের ঘোরে বিহ্বল হয়ে যাওয়া—এর জন্য যে কত নির্যাতন সহ্য করেছি অভিভাবকমণ্ডলীর কাছ থেকে, তা বলবার নয়। তাই সে মনকে একদিন টুঁটি টিপে মেরে ফেলে কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিনতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি নিজেকে।

বললাম, "আজকের দিনে ভাবুক মন নিয়ে জন্মালে যে দুঃখ আর অবিচার তার শিরোভূষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা জান?"

বললে, "শুধু আজকের দিনে কেন, চিরদিনই এটা ঘটে। কোন্ ভাবুক না অত্যাচারিত হয়েছেন ইতিহাসে, তুমি তা বল।"

বালিশে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিলাম ওকে, বললাম, "আচ্ছা, এত সব তুমি জানলে কেমন করে?"

ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললে, "শিখে রেখেছি তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য, বুঝলে।"

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়াল, বললে, "আসছি।"

সেই ওদের নিয়মধরা রীতি। প্রায় মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল ও। তেমনি খাবারের থালা আর গেলাস হাতে। বললাম, "যতদূর জেনেছি, তাতে বুঝেছি, খাওয়ানোর ব্যাপারটা শুধু প্রথম দিনটির জন্য। তবে আবার এ ব্যবস্থা হল কেন?"

বললে, "খেয়ে যে আস নি, এটা বোঝা কি খুবই কঠিন?"

"না, তা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু হোটেলে গিয়েও খেতে পারতাম তো।"

"না। এখানে যে একটি শত্রু রয়েছে, সেটি সে হতে দেবে না। নাও, এস।"

আসনে গিয়ে বসতে বসতে বললাম, "শত্রুপক্ষীয় এ অত্যাচার অমানুষিকতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?"

"তা অত্যাচারই যদি বল, সীমা একটু ছাড়াবে বই কি। এই, দাঁড়াও—"

"কী?"

কাছে এসে বসল মেঝের ওপরে, বললে, "একটা সাধ আমার মেটাবে?"

"কী সাধ?"

অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত দুটি চোখের দৃষ্টি। বললে, "রাগ করবে না?"

"না। বলই না তুমি।"

মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমি খাইয়ে দেব?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে! এ কী অদ্ভুত ওর প্রস্তাব!

ও কিন্তু এগিয়ে এল আরও কাছে, খাবারের থালায় হাত রেখে কেমন-যেন এক আবদার-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, "না, কোনও বারণ শুনব না কিন্তু।"

বললাম, "বারণ করব না একটি শর্তে।"

"কী?"

বললাম, "তোমাকেও সঙ্গে খেতে হবে কিন্তু।"

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল, বললে, "যাঃ!"

"যাঃ কী!"

বললে, "বিশ্বাস কর, আমি খেয়ে এসেছি।" বলে, আর আমার কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে তাড়াতাড়ি খাবারের গ্রাঁস হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠল, "নাও, এস। আর দেরি কোর না।"

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে গেলে মন।

খাওয়া ও খাওয়ানোর পর্ব চলতে চলতে মনে হল, এ মাধুর্যের আস্বাদ এ জীবনে কখনও পেয়েছি কি? আর এত মধুরই বা মনে হচ্ছে কেন এই সামান্য ব্যাপারটা! আমাকে এমনভাবে খাইয়ে ও-ই বা কীসের তৃপ্তি পাচ্ছে?

তৃপ্তি যে পাচ্ছে, সে তো মুখখানা দেখেই বোঝা যায়। যেন ছোট ছেলেকে হাতে করে খাওয়াচ্ছে স্নেহময়ী কেউ।

কিন্তু আমি কি ছোট ছেলে?

নই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন ছোটই হয়ে গেছি, ফিরে গেছি শৈশবে। মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলায়, আবছা মনে পড়ে মায়ের মুখ। মা সেই ছেলেবেলায় ডেকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে করে খাইয়ে দিত। ঠিক এমনটিই ছিল না কি সেই খাওয়ানোর ভঙ্গি?

বললে, "ভাবছ কী অত?"

"না, কিছু না।"

তারপরের অধ্যায়ে এসে শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলাম, "এত সব খুশি করার মন্ত্র তুমি শিখলে কেমন করে?"

কপট গাম্ভীর্যে বললে, "ওই যে বললাম, তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য।"

বললাম, "কই, অন্য মেয়েদের মধ্যে তো ঠিক এমনটি দেখলাম না।"

বললে, "তা আমার হয়তো শিখে নেবার ক্ষমতাটা বেশী।"

"তাই কি?"

হেসে ফেললে, বললে, "এসব জিনিস মেয়েরা আপনা-আপনি শেখে। তবে শেখাই তো সব কিছু নয়, চর্চা করতে হয়। আমার মা কী বলে জান? মা বলে, স্ত্রী-ভাবের আরাধনা করতে হয়। 'স্ত্রী' হয়ে জন্মালেই হয় না, স্ত্রী-ভাবের পরিস্ফুটনও হাওয়া চাই।"

"কী বোঝ তোমরা স্ত্রী-ভাব বলতে?"

"এই যাকে বলে—সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, উদারতা আর ভালবাসা। মা বলে—এসব গুণের আবার চর্চা করতেও হয়। কিন্তু কাকে আমরা করব সেবা? কে চাইছে আমাদের কাছে সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া আর উদারতা? অথচ এইসব বৃত্তিকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয় স্ত্রী-ভাব। স্ত্রী-ভাবের পরিণতি হচ্ছে অবশ্য আত্ম-বিলোপে।"

"সে আবার কী?"

"যা হয়েছিল কৃষ্ণের জন্য গোপিকাবৃন্দের। পুরুষোত্তম ভিন্ন তারা আর-কিছু জানত না। তাঁর মধ্যেই বিলীন করে দিয়েছিল তারা আপন গুণ, আপন প্রীতি, আপন লজ্জাও। মনের সে এক অতি উন্নত অবস্থা অবশ্য। কিন্তু যাক এসব কথা।"

আমার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "ভাল ছিলে এ কয়দিন?"

"ছিলাম।"

"মনে তো হচ্ছে না?"

"কেন?"

"চোখের ভাবে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য। কোথায় গেল সেই প্রশান্তি?"

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে কেটে যাবার পর বললাম, "আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি কেমন ছিলে বল?"

"আমাদের আবার থাকাথাকি কী?"

আমার বাহু-উপাধানে সেদিনের মত মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, বললে, "দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা কোর, বুঝলে ?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন তুললাম, "আচ্ছা, তোমরা কী বিবাহিত ?"

"হ্যাঁ। গলায় এই যে মঙ্গলসূত্রম্ রয়েছে।"

"আচ্ছা, তোমরা কি দেবদাসী ? মানে, দেবতার সঙ্গে কি তোমাদের বিবাহ হয়েছে ?"

উত্তরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "দেবদাসী-প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু আমরা আছি। সংস্কার কি মানুষের মন থেকে সহজে যায় ? শ্রীকৃষ্ণের ওই বড় মন্দিরের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আমরা ছেড়েছি, তবে নিজেদের মন্দির গড়ে নিয়েছি আমরা, যা শুধু মাত্র আমাদেরই।"

"কোথায় সেটা ?"

"আমাদের বাগানে। পুরুষোত্তমের মন্দির। তিনিই আমাদের স্বামী। নানান লক্ষণ দেখে আমাদের নিয়ে আসা হয় নানান গাঁ থেকে বেছে বেছে। অর্থের বিনিময়ে গরিব পিতামাতা রাজীও হয়। অনেক সময় মানত করেও দেবতার সঙ্গে দেওয়া হয় বিবাহ। অবশ্য এসব আজকাল অনুষ্ঠিত হয় খুব গোপনে। তা হলে দেখতে পাচ্ছ, আমরা দেবদাসী বটে, আবার না-ও বটে। আমরা 'দেববধূ' বলতে পার।"

"কিন্তু এ তোমাদের কী জীবন ?"

"সেটা ভাগ্য।"

বললাম, "আচ্ছা, বিয়ে করে সংসারী হতে সাধ যায় না ?"

একটু হেসে বললে, "কবার বিয়ে করব ? এই যা নিয়ে আছি, এ-ও কি বিরাট সংসার নয় ?"

"আর-একটা কথা বলব ?"

"বল।"

"কেমন করে সহ্য কর এত লোককে ?"

"মানে ?" আমার প্রশ্নের তাৎপর্য ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করলে, তারপরে বললে, "যদি বলি ভুল কথা বলছ।"

"ভুল ?"

"হ্যাঁ, এত লোক কোথায় দেখছ ? যদি বলি, একই লোক বিভিন্ন রূপ ধরে এক এক নিশায় আসে আমাদের কাছে ?"

একটু অবাক হয়েই বললাম, "এই তোমাদের বিশ্বাস নাকি ?"

"হ্যাঁ। বিশ্বাসও বটে, শিক্ষাও বটে।"

"মান ?"

"মানতে পারলে জীবনের পথে সহজ হওয়া যায়। না মানলেই দুঃখ। তা অনর্থক দুঃখ সইতে যাই কেন, তাই মেনে নিই সব-কিছু।"

চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। ও ধীরে ধীরে 'লতাবেষ্টিতক' ভঙ্গিতে আমাকে এক সময়ে টেনে নিল নিজের কাছে, ফিসফিস করে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, "যত দিন যাবে, জগৎ এক নূতন দৃষ্টিতে ধরা দেবে তোমার কাছে।"

"তার মানে !"

বললে, "তুমি বুঝবে, বিশ্বজগৎ অখণ্ড এক সুরে রয়েছে বাঁধা। তুমি দেখবে, কী সুন্দর, কী অপরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ! প্রতিটি প্রাণী আর উদ্ভিদে একই প্রাণচাঞ্চল্য।"

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ও এক আশ্চর্য কণ্ঠে বলে চলেছে, "তোমার তখন কী মনে হবে জান ! মনে হবে, এ জগতের সব মানুষই সুন্দর, সব মানুষই ভাল, সব মানুষই পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, একই আত্মা পুরুষ আর স্ত্রী-শরীর ধারণ করে পুরুষ ও স্ত্রীভাবে মণ্ডিত হয়ে আছেন। কবির দৃষ্টি বলে একেই, একেই বলে দিব্যদৃষ্টি।"

বাধা দিই নি, চুপচাপ ওরই চিন্তাধারাকে মনে মনে অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম।

বললে, "কী, কথা কইছ না যে ?"

"বলবে একটা সত্যি কথা ?"

"কী ?"

"তোমার আসল নামটা কী ?"

বললে, "বলা পাপ। তবু তোমাকে বলব। তোমার জন্য সমস্ত পুণ্যই জলাঞ্জলি দিয়েছি।"

সেদিন মনে হয়েছিল, এটা বুঝি কথার কথা। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, এ-কথার গুরুত্ব তার কাছে কতখানি হতে পারে!

বললে, "আমার আসল নাম ভামতী।"

ভামতী ? নামটা যেন ইতিমধ্যে কোথায় শুনেছি-শুনেছি বলে মনে হচ্ছে!

ভাবতে-ভাবতে মনে হল, প্রথম দিনেই কানে গিয়েছিল এই নাম। সেই নটরাজন লোকটি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেছিল, "কেমন আছে ভামতী ?"

চেট্টিবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, "চুপ চুপ।"

বলে উঠলাম, "নটরাজন বলে কাউকে চেন ?"

মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বললে, "বা রে, ও যে আমাদের গান শেখায়, নাচ শেখায়। মাঝখানে কিছুদিন ছিল না, আবার এসেছে।"

"গুরু বুঝি নাচের ?"

"তা বলতে পার, তবে গুরু বলে মানি না ওকে।"

"কেন ?"

"এমনি।"

কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে।

একসময় বলে উঠি, "কাল কী করব ? আসব কী করে এ-ঘরে ?"

"যেমন করে আজ এসেছ।"

উৎসাহিত হয়ে বলে ফেললাম, "আবার সেই বৃদ্ধ বেলগাছের পায়ে বসে সাধনা ?"

"ঠিক তাই।"

"বেশ, তাই হবে।'

পরদিন বৃদ্ধ বৃক্ষের পায়ে পেলাম একটি পদ্মফুল। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে 'পদ্ম'র নাম করতেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল চেট্টিবাবুর। কিন্তু মুহূর্তমাত্র, তার পরেই তেমনি স্মিতহাস্যে ভরে গেল তার মুখ, বললে, "যান বাবুজী। ভিতরে গেলেই পদ্ম খুঁজে পাবেন।"

বিপুল কেশরাশি আজ বেণীর শাসন থেকে মুক্ত করে এল খাওয়া-দাওয়ার পর। বললে, "খুব কাছে এস, ভাল কবে মুখখানা দেখে রাখি।"

"কেন ?"

কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে বললে, "ভয় হয, তোমাকে হারিযে ফেলব।"

বলতে বলতে দু চোখ ভরে এল জলে, বললে, "আমাব শাস্তি আসছে নেমে। আমি যে পাপ করেছি।"

"কী পাপ ?"

বললে, "তোমাকে যে গোপনে জানিযে দিযেছি ফুলের নাম।"

"দিয়েছ তো তাতে কী হয়েছে ?"

"না গো, নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এর ফল ভাল হবে না।"

অবিশ্বাসীর সুরে বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, হবে না ওঁকে বলেছে।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, "এই দেখ, এ কী করছ ভামতী ?"

শিউরে উঠে বললে, "নামটাও বলে দিয়েছি তোমাকে।"

"কেঁদো না, কেঁদো না, ছিঃ !"

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ভারী গলায় ডেকে উঠল, "কবি !"

ওর ডাকে বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুমরে উঠল, গাঢ়কণ্ঠে বললাম, "কবি শব্দটার অর্থ তো তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছ, যদি পারি তো সত্যি সত্যিই তোমার 'কবি' হয়ে উঠব।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের জ্যোতি, বললে, "একটা জিনিস তোমায় দিতে চাই, নেবে ?"

"কী ?"

উঠে বাক্স খুলে কী একটা নিয়ে এল যেন। কাছে আসতেই বুঝলাম একটা আংটি। সেটি নিজের হাতে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললে, "পোখরাজমণি, কখনও খুলো না যেন? সব সময় পরে থেকো।"

"কী হয় পরলে ?"

একটু হাসল, স্নেহস্নিগ্ধ অপূর্ব সে হাসি, বললে, "কী আবার হয় ? আমায় মনে পড়বে।"

ওকে দু হাতে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে : "যাবে কোথায় তুমি ?"

"কোথাও না। এখানেই।"

"তবে ? হারাবই বা কেন তোমাকে ?"

বললে, "পাগলামি কোর না। তুমি চলে যাও।"

একটু হেসে, ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়মথিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "চলে যাব ?"

আবার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে, "না, আর তুমি এসো না এখানে।"

"আসব না ! কেন ?"

জলভরা চোখ দুটি মেলে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলক, তারপরে বললে, "এমন করে মায়ায় জড়িয়ো না তুমি।"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম, "মায়ায় কী সত্যিই জড়িয়েছি ?"

"জড়াও নি !"

"কে জানে !"

বললে, "আমি জানি। আমি সব বুঝতে পেরেছি তোমার। তুমি নিজেকে যতটা বুঝেছ, তার থেকেও বেশী বুঝেছি আমি তোমাকে। তুমি মুক্তপুরুষ হও।"

"আর তুমি ?"

"আমি ?"—হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল আবার, বললে, "তুমি

তো জান, আমি কী! তুমি চলে যাবে, আবার অন্যদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলব, হয়তো গানও গাইব, নাচবও।"

অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠলাম, "তুমি নাচতে পার, না?"

"হ্যাঁ, শেখায় যে নটরাজন আমাদের।"—চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললে, "জান, কেউ এলে নাচ দেখানোটা আমি পছন্দ করি।"

বললাম, "আমাকে তো দেখালে না একদিনও।"

বড় ম্লান, বড় অদ্ভুত সে হাসি। বললে, "না। তোমাকে দেখিয়ে সময় নষ্ট করব কেন?"

"সময় নষ্ট কেন?"

কান্না আর হাসি যেন দুই-ই মিশিয়ে আছে। বললে, "নাচের শেষে পথিক যে ফিরে যাবে, সারারাত আর বিরক্ত করবে না।"

একটু অবাক হয়েই বললাম, "তাই নিয়ম বুঝি!"

"হ্যাঁ। শাস্ত্রকার বলেছেন জান না? নৃত্যশ্রমক্লান্তা স্ত্রী-শরীরকে আর ছুঁতে নেই।"

"তাই নাকি!"

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে লঘুকণ্ঠে বলে উঠলাম, "কিন্তু বাক্যশ্রমক্লান্তাকে নিয়ে এখন আমি কী করি?"

"ছুঁয়ো না।"

ভোরের দিকে চলে যাবার সময় বললাম, "কাল কী করব?"

"এসো না। কাল আমার ছুটি। বিরাম।"

"তা-ও পাও বুঝি?"

একটু হেসে বললে, "তা পাই বই কি।"

বললাম, "বেশ। পরশু?"

"পরশু?" একটু ভেবে বললে, "আবার সেই বৃদ্ধ বৃক্ষের পদসেবা কোর।"

"সুফল মিললে তাতে আর দ্বিধা কী ?"

হেসে উঠল, বললে, "সুফল মিলবে গো মিলবে।"

চেট্টিবাবু ততক্ষণে দেববিগ্রহগুলির পায়ের কাছে ধূপবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়ে আসনে বসেছে, সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটির বই ইতস্তত ছড়ানো, হয়তো বাইরে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

যথারীতি বললে, "চললেন বাবুজী ?"

"হ্যাঁ। বইগুলি কীসের ? বিশ্বনাথমের বুঝি ?"

আসন ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালে চেট্টিবাবু, বললে, "হ্যাঁ। ছেলেটি আমাদের এজেন্টের কাজ করে তো। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রাইভেটে কলেজের পড়াও তৈরি করছে।"

সেই পুরু-কাচের-চশমা-চোখে পাজামার ওপরে হাতগোটানো-শার্ট-পরা রোগা কালো ছেলেটির মুখ মনে পড়ল একবার। চেট্টি বললে, "বাবুজী, কেমন লাগল আমাদের ?"

"খুব ভাল।"

"না বাবুজী," চেট্টি বললে, "ভাল থাকা আর গেল না। সব বুঝি ভেঙে-চুরে যাবে।"

"কেন ?"

"বসুন না বাবুজী, সব বলছি আপনাকে। চা খাবেন ? দাঁড়ান, চা আনিয়ে দিচ্ছি।"

বসে পড়ে বললাম, "ব্যস্ত হবেন না।"

বললে, "ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে আসছে, তাই তাঁর স্ত্রীকে তিনি কিছুদিন এখানে রাখতে চান। কিন্তু আমরা কী করে রাখি বলুন তো ?"

"তা তো বটেই। আর তা ছাড়া, আপনাদের এখানে রাখার উদ্দেশ্য কী ?"

চেট্টি বললে, "উদ্দেশ্য একটা আছে। স্ত্রীকে উনি বোধ হয় ত্যাগই করতে চান।"

"সে কী !"

"হ্যাঁ বাবুজী। ওঁর এই স্ত্রী ছিল যে এখানকারই মেয়ে।"

"বলেন কী?"

ম্লান একটু হাসল চেট্টিবাবু, বললে, "ঘনশ্যামদাসজী ছিলেন আপনারই মত এক আগন্তুক, আপনারই মত রোজ আসতেন, ফুলের নাম বলতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি মেয়ের মায়ায় এমন করে জড়িয়ে পড়লেন যে বলবার নয়। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও ফুলের নাম গোপনে জানাজানি হতে লাগল, ঘনশ্যামদাসজী ক্রমাগত বাঁধনে জড়াতে লাগলেন। আর তার পরিণতি কী জানেন? জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখা। অর্থাৎ, এক রকম বিবাহই বলতে পারেন।"

বললাম, "এ-রকমটা হতে পারে তা হলে?"

তেমনি ম্লান হাসিই ওর মুখে, বললে, "হ্যাঁ, তা হয়ে গেল। সরোজাকে ধরে রাখা গেল না।"

"সরোজা?"

"ঘনশ্যামদাসজীর স্ত্রীর নাম।"

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললাম, "আপনারা নিশ্চয়ই বাধা দিয়েছিলেন এতে?"

"কাকে বাধা দেব?" চেট্টিবাবু বললে, "এই যে ঘরবাড়ি, এই যে জমি আর বাগান, এ সবই তো ঘনশ্যামদাসজীর। তাঁরই টাকায় চলছে এ প্রতিষ্ঠান।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ, বাবুজী।"

বললাম, "কিন্তু কেমন করে হল এটা?"

"টাকায় কী না হয় বাবুজী!" চেট্টিবাবু বললে, "কিন্তু সে অনেক কথা। সে সব শুনতে কি ভাল লাগবে আপনার?"

"কেন লাগবে না! আপনি বলুন।"

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল চেট্টিবাবু, তারপরে বললে, "এই ঘর বাড়ি আর বাগান, এ ছিল আমারই এক কাকার সম্পত্তি। কাকা

ব্যবসায়ী লোক, আমার কাছ থেকে যথেষ্ট বাধা পাওয়া সত্ত্বেও মোটা লাভের লোভে ঘনশ্যামজীকে বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু এ হল গিয়ে বাইরের ঘটনা, ভিতরে-ভিতরে যা ঘটেছিল, সে অন্য কাহিনী।"

আবার চুপ হয়ে গেল চেট্টিবাবু, সুগোপন কোন এক বেদনার তারে যেন বেজে উঠেছে অশ্রুত এক রাগিণী, তার আলাপন শোনাতে গিয়েও যেন শোনাতে পারছে না সে।

পর-মুহূর্তে হঠাৎই চমক ভেঙে উঠে দাঁড়াল চেট্টিবাবু, বললে, "ওই যা, আপনাকে চা এনে দেওয়া হল না! দাঁড়ান, এনে নিচ্ছি।"

"না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

"তা কি হয়!" চেট্টিবাবু ভিতরের দিকের দরজাটা খুলতে খুলতে বললে, "মেয়েদের মধ্যে কেউ চা করেছে কি না দেখছি। এক মিনিট।"

দ্রুত অপসৃত হল সে ভিতর-মহলে। মনে হল, আসবার সময় সমস্ত দরজাই তো দেখে এসেছি বন্ধ। এত ভোরে কে উঠেছে এক ভামতী ছাড়া?

পরক্ষণেই ফিরে এল চেট্টিবাবু, দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিতে দিতে বললে, "আসছে চা।"

মুখে কেমন যেন মিটিমিটি হাসি। যদি সত্যি সত্যি সে-ই চা নিয়ে আসে ঘরে?

কিন্তু ও-রকম হাসি কেন চেট্টিবাবুর মুখে? চেট্টিবাবু কি মনে মনে সব-কিছুই বুঝতে পেরেছে?

নিজের আসনে ধীরে-সুস্থে এসে বসল চেট্টিবাবু, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে, আবার ম্লান স্তিমিত মনে হতে লাগল ওর মুখের ভাব, বললে, "তখন আমার জোয়ান বয়স, বাবুজী। কাকা ছিলেন নিঃসন্তান, আমাকে ভালবাসতেন ছেলের মতো। কাকার তখন এক গদি ছিল এখানে, সেই গদিতেই বসতাম, পয়সার অভাব ছিল না, বন্ধুবান্ধবও জুটেছিল প্রচুর, ফলে যা হয়। তখন এসব অঞ্চলের চেহারা ছিল বীভৎস, হৈ-হল্লা-মারামারি-মাতলামি লেগেই

ছিল, খুন-জখমও হত ছুটো একটা। সবান্ধবে রাত্রের অভিসারে আমিও আসতাম বাবুজী। হৈ-হল্লা আমিও করেছি কত। মারামারিও করেছি। এক কথায়, সে আমার এক অমানুষিকতার যুগ গেছে বলা যায়।

"ক্রমে ক্রমে কাকার কানে উঠল সব। আমাকে শাসন করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কারুর প্রতি যে কোনও আকর্ষণ ছিল তা নয়, কেমন যেন একটা অদ্ভুত খেয়াল। প্রাচীনেরা 'বয়সের দোষ' বলে যে একটা কথা বলে থাকেন, এ বোধ হয় ছিল তা-ই।"

এই পর্যন্ত বলেছে চেট্টিবাবু, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল ভিতরের দরজাটা, হাতে ছু কাপ ধূমায়িত চা, ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল, আর কেউ নয়, সত্যি সত্যিই সে ভামতী।

জরি-পাড় সাদা একটা শাড়ি জরি-হাতা সাদা ব্লাউজের ওপর আঁট করে পরা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমাদের কাছে চায়ের কাপ ঠক করে রেখে এক মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল চেট্টিবাবুর সামনে মুখের ভাব কোনক্রমেই প্রকাশ করবে না, কিংবা তাকাবে না আমার দিকে চোখ তুলে। কিন্তু পারল না শেষ পর্যন্ত। ছুটি আয়ত চোখে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি আমার উপর মুহূর্তকালের জন্য স্থাপিত করে, তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল ভিতরে।

সম্ভবত সব-কিছুই লক্ষ্য করেছিল চেট্টিবাবু, মৃদু একটু হাসি যেন খেলে গেল তার ঠোঁটের উপর দিয়ে। বললে, "'দেহপ্রীতি' বলে একটা কথা আছে। ভাষান্তরে, এক ধরনের মোহও বলা যায়, নারীর প্রতি নরের সেই আদিম মোহ। কিন্তু যখন লোকে দেহবিলাসিনীদের উপর মন অর্পণ করে ফেলে, তখনই গড়ে ওঠে সংঘাত, গড়ে ওঠে নানান সমস্যা।"

কী হল মনের মধ্যে, হঠাৎ বলে ফেললাম, "ইঙ্গিতটা কি আমাকেই লক্ষ্য করে?"

একটু যেন অপ্রতিভ হল চেট্টিবাবু, তারপরে একটু হেসে বললে,

"না বাবুজী, ঠিক আপনাকে লক্ষ্য করে নয়, আমি সবাইকেই এ কথা বলতে চাই। অবশ্য, কিছু মনে করবেন না বাবুজী, আমি আপনার বিষয়টাও ভেবে দেখেছি।"

"কী ভেবেছেন?"

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, "এখানে যারা আসে, হৈ-হল্লা করতে দেওয়া হয় না তাদের, তবে অল্প-বিস্তর একটু যে সবাই নেশা করে না আসে এমন নয়, সেটা বাধ্য হয়েই আমাদের অনুমতি দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না বলেই আপনার কথা বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে।"

হেসে বললাম, "কী রকম!"

বললে, "আপনাকে আমার ভাল লেগেছে বাবুজী, তাই বন্ধু ভাবেই কথাগুলি খোলাখুলি বলছি, অপরাধ নেবেন না যেন। যে-মেয়েটি এইমাত্র এসে চা দিয়ে গেল, একে আপনার ভাল লেগেছে বুঝতে পেরেছি; কিন্তু একে পর পর কয়েকটা দিন আপনি পেলেন কী করে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম, "আপনিই বলুন তো কী করে?"

বললে, "ভাগ্য। ভাগ্যের জোরে পেয়েছেন। নইলে, ও মেয়েকে আমি জানি, ফুলের নাম জানাজানি হওয়া ও মেয়ের কাছ থেকে সম্ভব নয়।"

সত্যি কথা বলতে কী, চেট্টিবাবুর প্রশ্নের ধরন দেখে একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছিল মনে, এতক্ষণে বুকের ভিতর থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেল।

চেট্টিবাবু বলে যেতে লাগল, "অত্যন্ত ধর্মভীরু মায়ের মেয়ে ও। নিজেও ধর্মভীরু অত্যন্ত। এই যে নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এ খুব সাধারণ কথা নয়, এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আজও প্রতিটি হিন্দুর বুক কাঁপবে, এসব ভাগ্যহত মেয়েদের তো সবার আগে।"

বলে উঠলাম, "আমি মশাই ওসব মানি-টানি না।"

বললে, "জানি। অর্থাৎ ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে একটু কম। খাঁটি কর্মী মানুষ আপনি। সেই জন্যই আপনাকে নিয়ে আমার তত ভয় নেই।"

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর। বহুদর্শী লোক এই চেট্টিবাবু। আমার সম্বন্ধে এ যা ধারণা করছে, ভামতীর ধারণা থেকে তা একেবারে বিপরীত। বস্তুত, আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাও চেট্টিবাবুর মত। ভাবপ্রবণতা আদৌ নেই আমার মধ্যে, একটি মেয়েকে নিয়ে কল্পনার জাল বোনা বা তাকে নিয়ে মত্ত হওয়া, এ চিন্তাটাই আমার কাছে হাস্যকর। কিন্তু ভামতী বললে, আমি ভাবপ্রবণ। আমি কবি। আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

কথাটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছা হল। আর সঙ্গে সঙ্গে, নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ আর উল্লসিত মনে হতে লাগল। চেট্টিবাবুর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাল লেগে গেল লোকটিকে। ওর সান্নিধ্যে বসে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন নিজের স্ব-ভাবটাকে ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম স্বাভাবিক 'আমি'কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা কাঁটার মত মনে বিঁধতে লাগল। তাকে ভাল লাগে, তাকে ছাড়া অবসর-মুহূর্তে অন্য কাউকেও তো ভাল লাগল না! এটাই বা কেন?

পর-মুহূর্তে মনে হল; চেট্টিবাবুর অনুমানই ঠিক, ওকে আমার ভাল লেগেছে মাত্র। একটি মানুষকে কি আর-একটি মানুষের ভাল লাগে না? নিজের মনের মধ্যেই দুটি মন দুই বিপরীত স্রোতে সেদিন প্রবাহিত হচ্ছিল। তার দেওয়া হাতের আংটিটির দিকে তাকিয়ে সেদিন এক মন ভাবছিল—সে আমার মোহ, চেট্টিবাবুর ভাষায় 'দেহপ্রীতি'। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিল অন্য মন—সত্যিই কি তাই? অন্য কিছু নয়?

এই চিন্তায় অবতরণ করেই চেট্টিবাবুর একটা কথা ধক করে জ্বলে উঠল মনে। চেট্টিবাবু বললে, "মেয়েটি অত্যন্ত ধর্মভীরু, নবগ্রহ স্পর্শ করে ফুলের নাম গ্রহণ, এ নাম সে কখনও জানাজানি হতে দিতে পারে না।"

কিন্তু অবাকই হচ্ছিলাম মনে মনে, তা হলে সে সত্যিই জানাজানি হতে দিল কী করে তার নাম? খ্যাপার মত তাকে আমার খুঁজে ফেরা লক্ষ্য করে? না, সত্যিকার ভালবাসারই টানে?

পরক্ষণেই সচেতন হয়ে যেন জেগে উঠে বসলাম। কী এসব ভাবছি বসে বসে! একটা মেয়েকে কেন্দ্র করেই অলস চিন্তার জাল বুনে চলেছি এতক্ষণ! ভাবালুতা আর কাকে বলে!

চেট্টিবাবুও আপন ভাবনার গভীরে আপনিই ডুবে ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এতক্ষণে কথা বলে উঠল, বললে, "কাকা শেষ পর্যন্ত আমাকে সামলাতে না পেরে তাড়িয়েই দিয়েছিল বাড়ি থেকে। আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। কত জায়গায় যে ঘুরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ ঘোরাই আমার হয়েছিল তীর্থকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত, সোমনাথ মন্দিরে বসে আমার যেন দিব্যদৃষ্টি ফিরে এল। দিব্যদৃষ্টি বলা ভুল, মনে হল দেশে ফিরে যাই, কাজে লাগাই আমার অভিজ্ঞতা।

"এলাম। সত্যিই একদিন অবশেষে দেশে ফিরে এলাম। বাবুজী, নানান দেশ ঘুরে এসে নানান লোক দেখে এটুকু বুঝেছি, 'প্রস্টিটিউশন'কে একেবারে উচ্ছেদ করা যাবে না, তবে শোভন একটা রূপ দেওয়া যেতে পারে অবশ্য। আমার সাধ আর সাধনা হচ্ছে এই শোভনতাকে নিয়ে। প্রাচীন যুগে, শুনেছি, এ ধরনের 'দেবীপল্লী' ছিল শিল্প, কাব্য ও সংস্কৃতির লীলা-ক্ষেত্র। এ যুগেই বা তা না গড়ে উঠবে কেন? 'মৃচ্ছকটিকে'র বসন্তসেনার মত চারুদত্তকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার সাধ এদের অনেকেরই থাকে, কিন্তু সাধ আর সাধনা তো এক জিনিস নয়। তাই, সে জিনিস গড়ে ওঠে না, ক্রমশই ভেঙে পড়ে।"

থেমে গেলেন চেট্টিবাবু।

বললাম, "তা হলে, এখানকার নিয়মকানুন সব আপনারই সৃষ্টি?"

বললে, "না, আমার সৃষ্টি নয়। এ সবই প্রাচীন নিয়ম, আমি তা পুনঃপ্রবর্তিত করেছি মাত্র। এবং করে তার ফলও পেয়েছি। কোনও

হৈ-হল্লা, খুন-খারাপি, মাতলামি—এ সব এ অঞ্চলে আর নেই। অনেকটা সুসংহত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন। নয় কী?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

বললে, "কিন্তু এসেছিল সংঘাত। যেদিন এ সব বিষয় সম্পত্তি কিনে নেন ঘনশ্যামদাসজী, আমি চলেই যাব ঠিক করেছিলাম, ভেবেছিলাম, আবার যাব তীর্থে তীর্থে। কিন্তু উনিও যেতে দিলেন না, আর আমারও কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল এর উপর। নিজেরই তো সৃষ্টি, নিজে কেমন করে ভেঙে-চুরে দিয়ে চলে যাই বলুন? তাই রয়ে গেলাম।"

বললাম, "একটা কথা বলব?"

"বলুন বাবুজী।"

"এই ফুলের নাম রাখার নিয়মটা যতই প্রাচীন পদ্ধতি হক না কেন, এটা বোধ হয় না রাখলেই ভাল করতেন।"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল চেট্টিবাবু, "আমি জানি বাবুজী, এ প্রশ্ন আপনি করবেন। বহু লোকেই করেছে। কিন্তু, যাঁরা এ দেশে এ নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন প্রাচীনকালে, তাঁরা নমস্য, তাঁরা দূরদর্শী। আপনাকে আগেও বলেছি, এসব মেয়েদের সঙ্গে নিবিড় করে নিজের মনকে জড়াতে নেই। এদের বিয়ে করে ঘরে তুলে জীবন কাটানো যায় না। এরা ঘরনী হবার জন্য নয়। শুনলেন তো আপনি, ঘনশ্যামবাবু যে সরোজাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন, তাকে কিছুদিনের জন্য আবার এখানে রাখতে চাইছেন। ছেলের সামনে তাকে বার করতে লজ্জা হল। দেখবেন বাবুজী, আমি বলে রাখছি, সরোজাকে উনি শেষ পর্যন্ত ত্যাগই করবেন।"

"তাই কি আপনার ধারণা?"

"হ্যাঁ। আপনি দেখে নেবেন। আমি স-ব বুঝতে পারছি। এটাই হয় বাবুজী, এদের নিয়ে পুরুষের নেশা চিরকাল থাকে না।"

তর্কের খাতিরে আমি এর উপযুক্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম অবশ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরোজার প্রসঙ্গটা ওঠায় আমাকে বাধ্য হয়ে চুপ

করে যেতে হল। জাজ্বল্যমান এই উদাহরণ চোখের সামনে থাকতে এর বিপরীত প্রসঙ্গ কেমন করে তুলতে পারি আমি ?

আমরা কথা বলছি, এরই মধ্যে একটা হিন্দী গানের তানমালা বিস্তার করতে করতে সেই প্রথম দিনটির মতই ঘরে এসে ঢুকল নটরাজন,—'চল মন, চল, গঙ্গাযমুনাকে তীর !'

চেট্টিবাবু বলে উঠল, "এস নটরাজন, এস, খবর কী ওখানকার ?"

নটরাজনের মুখখানা ম্লান বিষাদগ্রস্ত মনে হল, বললে, "খবর ভাল নয় চেট্টিবাবু। ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেল।"

"সে কী !"

"হ্যাঁ। একে বৃদ্ধ বয়স, তার উপরে খুব খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া, বুকে 'প্যাচ'ও হয়েছে, অর্থাৎ প্লুরিসির আক্রমণ বলতে পার।"

"এখন কেমন ?"

"আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। বোধ হয় শেষ অবস্থা। তুমি এক কাজ কর। ওর মেয়েকে এইবার ওর কাছে পাঠিয়ে দাও।"

"ভামতীকে ?"

নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ চমকে কেঁপে উঠল বুকের ভিতরটা। মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, "কে ! ভামতী !"

ওরা দুজনেই ফিরে তাকাল আমার দিকে।

এক মুহূর্তের বিরতি। চেট্টিবাবু বললে, "হ্যাঁ বাবুজী, ভামতীর মায়ের কথাই আমরা বলাবলি করছি, সরস্বতী আম্মা। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন এ নাম ? চেনেন মেয়েটিকে ? আসল নাম ধরে কোনও মেয়েকে তো আপনার জানবার কথা নয় !"

ভয়ানক অপ্রতিভ হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে, কী বলা উচিত কী করা উচিত স্থির না করতে পেরে অবশেষে বলে উঠলাম, "মানে, যে মেয়েটি চা দিয়ে গেল, ওকে যেন একবার ভিতরে মনে হলে ডেকে উঠেছিলেন ওই নাম ধরে !"

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, সেই

মুহূর্তে বিশেষ আর কথা না বাড়িয়ে শুধু বললেন, "তা হবে। কিন্তু খুব সজাগ কান তো আপনার।"

তারপরেই আর দ্বিধা দ্বিরুক্তি না করে চট করে ভিতরে চলে গেল চেট্টিবাবু। 'চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

নটরাজন আমার দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে ধপ করে বসে পড়ল খাটের উপর, কপালে হাত দিয়ে নীরব নিস্পন্দ বসে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল চেট্টিবাবু। তার পিছন পিছন এল ভামতী। আমার কাছে একটু দাঁড়াল, একবার ব্যথাতুর দুটি চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে, ঠোঁট দুটি কেঁপেও উঠল, তারপরে দ্রুতপায়ে চলে গেল বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে।

চেট্টিবাবু নির্বাপিত-প্রায় ধূপকাঠিগুলিকে সরিয়ে ধূপদানিতে নূতন ধূপ সাজাতে লাগল একমনে, সেই দিকে তাকিয়ে, তারপরে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, চেট্টিবাবুকে উদ্দেশ করেই বলে উঠল, "ইনিই সেই বাঙালী বাবুটি, না?"

"হ্যাঁ।"

সস্মিত মুখে নটরাজন বললে, "নমস্কার মশায়। অনেক শুনেছি আপনার নাম।"

"কার কাছে?"

"এই আমাদেরই মধ্যে আলোচনা হয় তো, তাই।"

পরে চেট্টিবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "ও কোথায় গেল? আমাদের বিশ্বনাথম্?"

"ঘনশ্যামদাসজীর বাড়ি। এই এত ভোরেই ডেকে পাঠিয়েছে।"

বলে উঠলাম, "আচ্ছা চেট্টিবাবু, উনি এ প্রতিষ্ঠান চালান কেন আজও? সরোজাকে তো উনি পেয়েই গেছেন, আর এটা তারপরে চালিয়ে লাভ? কী স্বার্থ ওঁর?"

"স্বার্থ!" বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল চেট্টিবাবুর মুখে, বললে,

"আমাদের সবারই স্বার্থ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি জুড়ে। আমার তো বটেই, এমন কি নটরাজনেরও। বিশ্বনাথমেরও।"

তারপরে, একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলে, "ঘনশ্যামদাসজী হচ্ছেন ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসার খাতিরে বহু লোককেই ওঁর হাতে রাখতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সেদিক থেকে ওঁর বিশেষ কাজে লাগে। যেমন করে আপনি সহজেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এখানে। আর আমার স্বার্থ? আমার স্বার্থ হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানেরই মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আবার পুনরাবিষ্কৃত করা। নটরাজনের স্বার্থ হচ্ছে অবশ্য অন্যরকম। এদের মধ্য থেকে সে বড়দরের গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলতে চায়। আর, বিশ্বনাথমের স্বার্থ? তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে এই প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি-স্বরূপ তার যা আয় হয়, তা থেকে।"

নটরাজন বলে উঠল, "তাঞ্জোরের মেয়েরা এইভাবেই 'ভারতনাট্যম্'কে রক্ষা করেছিল। আমার কথা হচ্ছে, এরাই বা পারবে না কেন? এখানকার এক-একজনের এমন ছন্দোময় শরীর, এই ধরুন না কেন, যে মেয়েটির কথা হচ্ছিল, সেই ভামতী বলে একটি মেয়ে—"

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল নটরাজন, তারপরে কী মনে করে বলে উঠল, "কিন্তু কী হল চেট্টিবাবু? যাবে না সরস্বতী আম্মার কাছে?"

"হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আমি বিশ্বনাথমের জন্য অপেক্ষা করছি নটরাজন।"

"ও, হ্যাঁ, তাও তো বটে।" নটরাজন বললে, "সরোজাকে নিয়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনলাম। ঘনশ্যামদাসজী তাকে আর কাছে রাখতে চান না, এইখানেই ফেরত পাঠিয়ে দিতে চান নাকি!"

সরোজার কথায় গম্ভীর হয়ে চেট্টিবাবু বললে, "সংঘাত যে শেষে এভাবে একদিন নেমে আসবে, তা ভাবি নি। আমি স্থির জানি নটরাজন, এখানে এসে থাকবার ফন্দী ওর নিজের, নইলে ঠিক এ চিন্তা মাথায় আসত না ঘনশ্যামদাসবাবুর।"

একটু হাসল নটরাজন, বললে, "কিন্তু কেন সরোজার এ চিন্তা? ওর থাকবার জায়গার অভাব হবে ঘনশ্যামদাসজীর কল্যাণে, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

মুহূর্তে চোখে দুটি ধক করে জ্বলে উঠল চেট্টিবাবুর, বললে, "কিন্তু, আমিও চেট্টিবাবু। এখানকার বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় আমার নামে। আমিও দেখব আমার বিরুদ্ধে যায় কে এখানে!"

নটরাজন বললে, "কেউ যাবে না। যেতে সাহসও করবে না। আমি এখানকার লোক নই, তামিলনাদের লোক, অথচ এখানে পড়ে আছি অদ্ভুত এক মায়ার শিকল পায়ে জড়িয়ে। বুঝলেন বাবুজী, বাইরে ঘুরতে বেরই, আবার ফিরে-ফিরে ঠিক আসি এখানে। 'আলারিপ্পু', 'পদম্' এইসব শেখাই 'ভারতনাট্যমে'র, আমাদের জিনিস আমরা না বাঁচিয়ে রাখলে কে রাখবে? কিন্তু দম চাই, স্বাস্থ্য চাই, পরিশ্রম করার শক্তি চাই, নইলে কী করে হবে? এই চেট্টিভাইয়ার কঠোর নিয়ম-নীতির জন্য তবু অনেক কাজ করা যাচ্ছে, নইলে সব ভেঙে-চুরে যাবে।"

বাইরের দরজায় ঠিক এই সময় বেজে উঠল একটা করাঘাত। চেট্টিবাবু প্রশ্ন করলে, "কে?"

"আমি। বিশ্বনাথম্।"

মুহূর্তে ওদের ভঙ্গিমায় দেখা গেল নিদারুণ ঔৎসুক্য। চেট্টিবাবু বললে, "দরজা খোলাই আছে। ভিতরে এস।"

কিন্তু ভেজানো কপাট ঠেলে প্রথমেই যে ঘরে এল, সে বিশ্বনাথম্ নয়, একটি মেয়ে। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। তার পিছনে-পিছনে অবশ্য এল বিশ্বনাথম্, ছোট একটা চামড়ার সুটকেস হাতে।

যারা এ-বাড়িতে থাকে, তাদেরই বয়সী হবে এ-মেয়েটি, রূপের দিক থেকে নয়টি মেয়ের মধ্যেই মিশে যাবার যোগ্য। শুধু মিশে কেন, নজনের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। এটা এক-

নজর দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু, এই কি সরোজা, ঘনশ্যামদাস-বাবুর স্ত্রী?

বিশ্বনাথম্ হাতের সুটকেসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, "ভীষণ ব্যাপার। ঘনশ্যামদাসবাবুর ছেলে রামদাসবাবু টেলিগ্রাম করেছে আসছে বলে, আবার ওদিকে ওঁর সেই ইঁদুর—বাচ্চু, সে মারা গেছে হঠাৎ। উনি তো পাগলের মত হয়ে গেছেন।"

সোনার ঝুমঝুমি-পরা বাচ্চু! সেই টুন-টুন-টুন-টুন করতে করতে এগিয়ে এসে ঘনশ্যামজীর হাত থেকে হালুয়া খাওয়ার ছবিটি মুহূর্তে ভেসে উঠল চোখের সামনে।

মেয়েটি ততক্ষণে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চেট্টিবাবুর দিকে। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে চেট্টিবাবু সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ঋজু দৃষ্টি-পাতের সম্মুখে। তারপরে শুধু বলে উঠল, "কে, সরোজা?"

"হ্যাঁ। থাকতে এলাম আমার পুরনো জায়গায়।"

"কিন্তু তা কী করে হয়! তুমি হচ্ছ ঘনশ্যামদাসবাবুর—"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল মেয়েটি, "উনি আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছেন।"

মনে হচ্ছিল, কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে চেট্টিবাবু ওর সামনে, বললে, "ও, আচ্ছা, বেশ।"

আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে দৃঢ় পদক্ষেপে ভিতরে চলে গেল মেয়েটি।

ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে চেট্টিবাবু বললে, "ও যে ভিতরে গেল, থাকবে কোন্ ঘরে? তুমি এক কাজ কর বিশ্বনাথম্, সব থেকে ছোট মেয়েটার নাম যেন কী! ভারাহালু। তাকে তুমি রেখে এস অন্য বাড়িতে। এখানে তো নজনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই।"

"ভারাহালু!"

"হ্যাঁ," চেট্টিবাবু বললে, "এতে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন বিশ্বনাথম্! শুধু রূপ নয়, গুণের কথাটাও ধরতে হবে। সেদিক থেকে ভারাহালুকে অন্যত্র রাখায় অপরাধ হবে না আশা করি।"

বলেই দু হাত জোড় করে দেওয়ালে আকীর্ণ দেবমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে চেট্টিবাবু বলে উঠল, "যাও বিশ্বনাথম্, যা বললাম কর গে। সব জেনে শুনে দ্বিধা করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।"

"যাচ্ছি।"

বিশ্বনাথম্ ভিতরে যেতেই উঠে দাঁড়াল নটরাজন, বললে, "যাবে না ভাইয়া, সরস্বতী আম্মাকে দেখতে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, চল।"

বললাম, "চেট্টিবাবু, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?"

নটরাজন বলতে যাচ্ছিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না—"

বাধা দিয়ে বলে উঠল চেট্টিবাবু, "কেন বাবুজী, আপনি যেতে চান কেন?"

একটু হেসে বললাম, "এমনি। মানে—সব শুনে-টুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে চেট্টিবাবু বললে, "অযথা কৌতূহল কি ভাল? মন শান্ত করে বাড়ি যান বাবুজী। আপনি মানী লোক, আমাদের এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামানোই ভাল।"

একটু অপ্রস্তুতের মতই বলে উঠলাম, "না না, অন্য কিছু নয়, মানে, যদি কোন উপকারে লাগতে পারি—"

বাধা দিয়ে চেট্টিবাবু তাড়াতাড়ি বললে, "ধন্যবাদ বাবুজী। সে রকম বুঝলে নিশ্চয়ই খবর দেব। আজ আসুন। নমস্কার।"

পথে আসতে আসতে চেট্টিবাবুর আচরণটা অনাবশ্যক রূঢ় মনে হচ্ছিল। আমি গেলে হয়তো ভাল হত, হয়তো সে একটু ভরসা পেত, হয়তো আমি নিজে কাছে থেকে উপযুক্ত শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এতটা চিন্তা আমার পক্ষে না করলেও চলবে। সত্যিই তো, ওদের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যার জন্য কত লোক রয়েছে,

চেট্টিবাবু নিজে একাই একশো, আমি তার মধ্যে মিছিমিছি অনুপ্রবেশ করি কেন ?

এ-কথাটা মনে হতেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল্ল মনের ভার। সহজ স্বাভাবিক গতিতে পা ফেলতে ফেলতেই বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু, এ কী হয়েছে বাড়ির পরিবেশ ! ঘনশ্যামদাসজীর কর্মচারীর দল এধারে ওধারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু-একজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। বাড়ির বাইরে কিছু জনতার ভিড়। তাদের সরিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে চোখ পড়ল পাম্বলুর। বললে, "এসেছেন বাবুজী ! উনি যে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জানেন কী হয়েছে ?"

সংক্ষেপেই বললাম, "জানি পাম্বলু।"

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর পাম্বলু আমার কাঁধের কাছে হাতটা রেখে আমাকে চুপিচুপি সরিয়ে নিয়ে এল বারান্দার এক ধারে, তারপরে ফিসফিস করে নিম্নকণ্ঠে বললে, "দেখলেন সরোজাকে ? এমন মেয়ে দেখি নি। উনি টাকাকড়ি দিতে চাইলেন, কিছুই সে নিল না, মাথা উঁচু করে নিজের সামান্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সোজা ঘর থেকে পথে নেমে পড়ল।"

"তুমি কী চিনতে আগে থাকতে ?"

পাম্বলু একটু আমতা-আমতা করে বললে, "না, তা ঠিক চিনতাম না, তবে পরিচয়টা সবই জানতাম। কিন্তু, আসল কথাটা তা নয়।"

"তবে ?"

"ঘনশ্যামদাসবাবু ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্য কারণে।"

"কী ? তাঁর ছেলে আসছে বলে তার করেছে সেইজন্যে ?"

একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকাল পাম্বলু, বললে, "অনেক খবরই দেখছি ওখান থেকে পেয়ে গেছেন বাবুজী। হ্যাঁ, ওঁর ছেলে রামদাসবাবু এসে পৌঁছচ্ছেন কাল সকালে। সেই জন্যই তো

সরোজাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু, ব্যাপারটা এও নয়।"

—"তবে ?"—এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে পাম্বলু কিছু বলবার আগেই বলে উঠলাম, "জানি। বাচ্চু মারা গেছে, সেই-শোকটাই ওঁর বড্ড লেগেছে, তাই না ?"

"ঠিক তাই ?" পাম্বলু বললে, "সব ছাপিয়ে বাচ্চুকে হারানোর দুঃখটাই ওঁর কাছে মর্মান্তিক হয়েছে। বুড়ো একটা ইঁদুর মরে গেছে তাইতে এত শোক এ এক দেখবার জিনিস বাবুজী ! চলুন না ওর ঘরে। নীচে গদিতেই বসে আছেন। আপনাকে দেখলে, আপনার সঙ্গে কথা বলে হয়তো কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন।"

বললাম, "বেশ, চল।"

"আসুন বাবুজী।"

লাল কাপড়ের ঝালর দেওয়া অতিকায় একটা তালপাখা হাতে নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা চাকর, ঘনশ্যামদাসবাবু গদির উপরে বসে আছেন, একটা গেঞ্জি মাত্র গায়ে, চোখের নিচে কালি, মুখখানা দেখাচ্ছে বিশীর্ণ পাণ্ডুর, মাথার চুল এলোমেলো, মূর্তিমান শোকেরই প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

আমাকে দেখামাত্রই ভগ্ন কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন ঘনশ্যাম-দাসবাবু, "বাচ্চু নেই, বাবুজী, বাচ্চু নেই !"

সবই শুনেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা চোখে দেখে আমার একটু অদ্ভুতই লাগছিল। একটা ইঁদুরের জন্য মানুষ সত্যই যে এত শোকাকুল হতে পারে, এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে ছদ্ম গাম্ভীর্য ধারণ করা ছাড়া আমার আর-কোন উপায় নেই, বললাম, "কোথায় বাচ্চু ?"

"দেরিতে এলেন বাবুজী, নইলে শেষ দেখাটা দেখতে পেতেন।"

বলতে বলতে সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললেন ঘনশ্যামদাসবাবু, "এই একটু আগে ওকে শ্মশানে নিয়ে গেল।"

"শ্মশানে!"

পান্থলু এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ বাবুজী। বহু লোক সঙ্গে গেছে। সানাই-টানাই বাজিয়ে—রীতিমতো শোভাযাত্রা। আমিও যেতাম, কিন্তু আমার হাতে একটা কবচ আছে, শ্মশানে যাওয়া মানা।"

উত্তরোত্তর আমার অবাক হবার পালা। নিম্নকণ্ঠে পান্থলুকে বললাম, "ঘনশ্যামদাসজী গেলেন না কেন?"

পান্থলু বললে, "শেঠজীকে আমরাই যেতে দিলাম না।"

কথাটা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন, "না বাবুজী, গেলাম না, ওরা ওকে পোড়াবে, এ দৃশ্য আমি চোখে দেখতে পারব না।"

ওঁর আকুলতা আর শোকদুঃখ অনুভব করতে করতে আমার হঠাৎ অন্য একটা কথা মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল। মনে হল, যিনি এই বিচিত্র বিশ্ব আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মনোরাজ্যেও তাঁর কি বৈচিত্র্যের লীলা! এই যে বাচ্চুর জন্য শেঠজীর এত কান্না, এ হয়তো নিছক বাচ্চু নামক ইঁদুরটির জন্য একেবারেই নয়, যার নাম ওঁর মুখে একবারও উচ্চারিত হচ্ছে না, সেই সরোজাকে হারানোর তীব্র বেদনারই এ হয়তো এক বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ, কে বলতে পারে!

চিন্তাটা জাগবার সঙ্গে সঙ্গে, যত না সমবেদনায় মথিত হতে লাগল মন, তার থেকেও আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজেই নিজের চিন্তাধারাকে অনুধাবন করে। শেঠজীর মনের ব্যথা বুঝতে গিয়ে, যিনি মন-জীবন-বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তার কথা এমন করে হঠাৎই আমার মধ্যে জেগে উঠল কেমন করে! এ ভাবে কখনও তো চিন্তা করি নি আগে। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে খনিজ পাথর বার করে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্র্য নিয়েই ছিল আমার নিজস্ব চিন্তার জগৎ, তার মধ্যে কী-ভাবে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শ এসে পড়ছে আজ বারংবার!

"তুমি কবি।"

একটি মেয়ের মুখের কথা মানুষের মনকে এমন করে নাড়া দিতে পারে, নিজের কাছে এও যেমন এক আবিষ্কার, আর, এখন, এই মুহূর্তে, শেঠজীর মনোরাজ্যের এক বিশেষ পরিচিতির কথা, আমার মনের দিগন্তে অভাবিতরূপে ভেসে ওঠা, এ আবিষ্কারও কম মূল্যবান নয়।

এরই প্রচ্ছন্ন আনন্দে বিভোর হয়ে ওঁর একেবারে পাশে গিয়ে বসলাম আমি। বললাম, "শেঠজী, একজনের চলে যাওয়াটা সহজ, কিন্তু সে যা দাগ রেখে চলে যায়, তা মুছে যাওয়াটা সহজ নয়।"

একটু যেন অবাক হয়েই তাড়াতাড়ি আমার মুখের দিকে তাকালেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকবার পর বললেন, "বাবুজী, বাচ্চু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স-ব চলে গেল।"

এই 'স-ব' চলে যাওয়ার কথাটা উল্লেখ করে ঘনশ্যামদাসজী কী ইঙ্গিত করলেন কে জানে, আমি সরোজার কথাটা পান্থলু আর চাকরটা থাকায় বলি-বলি করেও বলতে পারলাম না। নইলে আমি যে সরোজার ব্যাপারটা সব জেনে গেছি, তা ওঁকে বুঝিয়ে দেবার এ-ই ছিল সুযোগ।

অন্য প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে গেলাম। বললাম, "কী হয়েছিল?"

শেঠজীর চোখ আবার এল ছলছল করে, বললেন, "ভোরে উঠে যেমন ওকে ডাকি, তেমনি ডাকছি, কিন্তু এল না। ভিতরে গিয়ে দেখি, নর্দমার ধারে বাচ্চু মরে পড়ে আছে, গলার কাছে প্রকাণ্ড ক্ষত, কোন বড় জন্তু, ভাম-টাম হবে হয়তো, টুঁটি কামড়ে ওকে মেরে ফেলে থাকবে।"

"হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু—"

"হ্যাঁ বাবুজী, এই 'কিন্তু'র কথাটাই ভাবছি। এত বছর ও আমার কাছে আছে, কোনদিন কিছু হল না, আজ হঠাৎ ওকে মেরে ফেললে কেন?"

বললাম, "আচ্ছা শেঠজী, অন্য কিছু নয় তো? মানে, ওর গলায় গয়না ছিল, তার লোভে—"

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "জয় সীয়ারাম! না না, সে সব নয়, ওই দেখুন, ওর গলার সেই সোনার ঝুমঝুমিটা আমার সামনেই পড়ে আছে খবরের কাগজটার উপরে।"

এতক্ষণে চোখে পড়া উচিত ছিল। ওঁর সামনেই খবরের কাগজের ভাঁজে জ্বলজ্বল করছে বাচ্চুর ঝুমঝুমি। বললেন, "এটা ওরা খুলে রেখে গেছে। কিন্তু, আমি ওটা কী করে সিন্ধুকে তুলি বলুন তো বাবুজী? পান্থলু, এটা তুমি দান-খয়রাতের কাজেই লাগিও।"

"আচ্ছা, শেঠজী।"

"রামদাস এসে পড়ার আগেই এর গতি করতে হবে। সে হচ্ছে এ যুগের পড়ি-লিখি আদমি, বাচ্চু যে আমার গণেশজীর বাহন, এ কথা হয়তো সে বিশোয়াসই করবে না।"

"তাই হবে, শেঠজী।"

"নিয়ে যাও ওটা, এখুনি নিয়ে যাও।"

পান্থলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, শেঠজী, সে আমি কেমন করে পারব! আপনি ছুঁতে পারছেন না, আমিও বা ছুঁই কী করে!"

"কেন, তুমি ছোঁবে না কেন?"

"আজ্ঞে, মৃত জীবের ধারণ-করা বস্তু, ব্রাহ্মণ হয়ে আমার কী ছোঁয়া উচিত?"

শেঠজী বললেন, "তাও তো বটে। কিন্তু, ওটা যে বিক্রি করতে হবে। বাচ্চুর শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে সে টাকা ভাগ করে দিতে হবে।"

"সে ওরা এসে পড়ুক, ওরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে নেবে।"

"বেশ। তাই হক।"

"আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরা কেউ এল কিনা!"

"যাও। এ চাকরটাকেও নিয়ে যাও, পাখার বাতাসে আমার দরকার নেই। বাবুজীর সঙ্গে নিরিবিলি একটু কথা বলব।"

পাখাটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে চাকরটা চলে গেল, পান্থলুও গেল বাইরে।

শেঠজী বললেন, "আমার লক্ষ্মী চলে গেল বাবু, আমার এখানকার কাজকর্ম সব যাবে।"

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে উঠলাম, "আচ্ছা, ঘনশ্যামদাসজী, আপনারা সবাই এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন? একটা বুড়ো ইঁদুর মারা গেছে, তাতে হয়েছে কী?"

যেন শিউরে উঠলেন আতঙ্কে, বললেন, "মামুলী ইঁদুর নয় বাবুজী, গণেশজীর বাহন।"

বললাম, "ঘনশ্যামদাসজী!"

"বলুন।"

"শুধু কি বাচ্চুর জন্যই আপনার মনটা হু-হু করছে? আর কারুর জন্য না?"

"না, বাবুজী, আর কারুর জন্য না। বাচ্চুর চেয়ে বড় আর আমার কাছে কেউ না।"

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন তিনি। ওঁর কান্না আর অকপট উক্তিতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, আগে হলে এ উত্তরেই কৌতূহল আমার মিটে যেত, কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ওঁর অবচেতন মনে বইছে অন্য এক হাহাকারের স্রোত। হয়তো সে-কথা ওঁর নিজেরও স্পষ্ট জানা নেই।

তুলতে পারতাম সরোজার কথা। কিন্তু মনে হল, ঠিক সেই মুহূর্তটি এখনও আসে নি। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "আজ্ঞা দিন, আমি ঘরে যাই শেঠজী। সেই সকাল থেকে—"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন শেঠজী: "আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বিশ্রাম করুন বাবুজী, কাল সকালে আমার ছেলে আসবে, তার সঙ্গে আলাপ করবেন, আমার পড়ি-লিখি ছেলে, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল।"

"অবশ্যই আলাপ করব।"

চলে এলাম উপরে, নিজের ঘরে।

তারপরে কাটতে লাগল সময়, অফিসের জমানো কিছু কাগজ-

পত্র দেখাশোনার কাজ সেরে স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর চুপচাপ শুয়ে রইলাম সারা দুপুরটা। ইতিমধ্যে 'বাচ্চু'র সৎকার শেষ করে ফিরে এল শ্মশানবন্ধুরা, সে এক রীতিমতো কোলাহল। আমি আর নীচে নামি নি। শ্মশানবন্ধুরা আবার একসময় চলে গেল, আবার চুপচাপ হয়ে গেল বাড়িটা।

বিকেল হয়ে আসছে, শুয়ে শুয়ে হাতের আঙুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভামতীর দেওয়া সোনার আংটিটাই দেখছিলাম। হরিদ্রাভ জ্বলজ্বলে প্রায়-চৌকো একটা পাথর পড়ে আছে সোনার বেষ্টনীতে।

আংটিটা সামান্য একটু বড় হয়েছে আমার আঙুলে। নিঃসন্দেহে এটি পুরুষেরই হাতের আংটি,—এটা ও পেলেই বা কোথা থেকে ? আর পাওয়া জিনিসই যদি, এমন করে আমাকে উপহার দিলই বা কেন ?

শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তা করতে করতে কখন যে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল কে জানে, চাকরটার ডাকে যখন জেগে উঠলাম, তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে রওনা হলাম চেট্টিবাবুর উদ্দেশে। বেরবার সময় শেঠজীর গদির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করেছিলাম, গদিতে তিনি নেই, একা পান্থলু বসে কী সব কাগজপত্র নিয়ে যেন লেখাপড়ায় ব্যস্ত, উপরতলাটা অন্ধকার। হয়তো সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে একা ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন ঘনশ্যামদাসজী।

দরজা বন্ধ ছিল। টোকা দিতেই চেট্টিবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ভিতরে আসুন।"

আমি প্রবেশ করতেই একটু অবাক হল চেট্টিবাবু, বললে, "বাবুজী, আপনি ! আমি ভেবেছিলাম, অন্য কেউ। আসুন, বসুন।"

বসলাম গিয়ে কাছে। সেই নবগ্রহের মূর্তিসমন্বিত ঘরখানি, সেই ভিতরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীতলহরী।

চেট্টিবাবু একটু হেসে বললে, "এত যে কাণ্ড, নটরাজনের গানের কিন্তু বিরাম নেই। সে ঠিক ভিতরে গিয়ে তানপুরা নিয়ে বসেছে।"

বলে উঠলাম, "কেমন আছেন সেই মহিলাটি ?"

"কে ? ভামিতীর মা ? ভাল নয়।"

"চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হল ?"

"নিশ্চয়ই। আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার আসছেন। তবে খুব ভরসা দিচ্ছেন না। শেষ বয়সে কতখানি যুদ্ধ করা সম্ভব ?"

ঠিক এই সময় দরজায় আর-একবার টোকা বেজে উঠল কার যেন। চেট্টিবাবু একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপরে বলে উঠল, "ভিতরে আসুন।"

দরজা ঠেলে ঘরে এলেন স্থূলকায় এক ব্যক্তি, ধুতির উপরের দিকে কমলালেবু রঙের হাফশার্ট গায়ে, বাঁ হাতের কব্জিতে মোটা নিকেলের-ব্যাণ্ডে-ঘেরা সোনালী রিস্টওয়াচ্।

কথাবার্তায় বুঝলাম, অতিথিবর্গেরই একজন হবে। ফুলের নামের প্রশ্নে, অতি অদ্ভুত, লোকটি একটু ভেবে নাম উচ্চারণ করল, 'চম্পা!'

কোন ভাবেরই ক্রিয়া দেখা গেল না চেট্টিবাবুর মুখে, কিন্তু কী জানি কেন, আমার বুকের মধ্যটা হঠাৎই ধক্ করে উঠল। জানি, নাম বদলায়, তবু আমার প্রথম দিনের প্রথম-উচ্চারিত নামটির সঙ্গে স্মৃতি এমন বিজড়িত হয়ে আছে যে, ওই নাম মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল করে করে তুলল আমাকে।

লোকটি যথারীতি ভিতরে প্রস্থান করতেই আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, "চেট্টিবাবু!"

তার সেই খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে, কী একটা নামের উপর যেন লাল কালির রেখা টানছিল চেট্টিবাবু, মুখ তুলে বললে, "কী ?"

বললাম, "একটা কথা বলব ? সে তো আজ আসে নি এখানে ?"

একটু যেন অবাকই হল চেট্টিবাবু, বললে, "কে ?"

তারপরেই একটু হেসে বলে উঠল, "ও, বুঝেছি। না মা, সে আজ আসবে কী করে তার মাকে ছেড়ে? কিন্তু বাবুজী, আপনার কথাটা কী? বসে আছেন, ফুলের নাম করুন?"

"ফুলের নাম!"

ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এবং সত্যি কথা বলতে কী, সে-সব কিছু মনে করেও আমি আসি নি। চেট্টিবাবুর কাছে ছুটে এসেছিলাম শুধু একটি সংবাদ জানতে। কেমন আছে তার মা?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে কথাটাই বা বলি কী করে চেট্টিবাবুকে? তার মা অসুস্থ, সেই ব্যাপারে আমারই বা অনর্থক মাথা-ব্যথা কেন?

ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করা চেট্টিবাবুর পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় বা অযৌক্তিক হয় নি, বরং জিজ্ঞাসা করাই স্বাভাবিক। এবং আমার পক্ষেও স্বাভাবিক হবে, আগের মতোই কোন ফুলের নাম করা।

একটু ইতস্তত করেই বললাম, "ফুলের নাম! হ্যাঁ, তা করছি। এই নিন, আগে টাকাটা রাখুন।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল চেট্টিবাবু, বললে, "টাকা থাক্ বাবু, আগে কোনও ফুলের নাম করুন দেখি?"

"কেন? আগে তো টাকা দেওয়াই নিয়ম!"

"তা হক, করুনই না?"

একটুক্ষণ থেমে সত্যিই কোন ফুলের নাম বলতে চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছিল, সত্যিই তো, এখানে যখন এসেছি, তখন ওসব মিথ্যা ভাবালুতায় কাজ কী? করি যে-কোন একটা ফুলের নাম, করা যাক যে-কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ! কিন্তু, আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে চট করে কোন ফুলের নামই মনে পড়ল না।

"কী হল? বলুন?"

"বলছি। এই ধরুন—"

বলতে বলতেও থেমে গেলাম, 'চম্পা' ছাড়া আর তো মনে পড়ছে না কোনও নাম! ঘুরে ফিরে 'চম্পা' নামটাই বা এত করে জাগছে কেন মনে!

একটু বাঁকা হেসে চেট্টিবাবু বললে, "মনে আসছে না তো কোনও ফুলের নাম? থাক্ বাবুজী, মনে করে কাজও নেই।"

বলেই খেরো বাঁধানো খাতাটা বন্ধ করে দিল চেট্টিবাবু। বললে, "বিশ্বনাথম্‌কে একটা কাজে ভিতরে পাঠিয়েছিলাম। দাঁড়ান, ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

"কেন?"

"ওকে আমার আসনে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে একটু বেরব।"

"কোথায়?"

একটু থেমে তারপরে বললে, "বাবুজী, আমাকে একটা লোহার তৈরী মানুষ বলে আপনারা মনে করেন, না? আমারও একটা মন আছে, আমিও সব বুঝতে পারি।"

"কী?"

কাছে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল, আর অতি অদ্ভুত চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠল, বললে, "সরোজা আজ থেকেই এ-বাড়ির নয়জনের একজন হয়েছে, ফুলের নামও নিয়েছে,—এই পরিবর্তনটার কথা চিন্তা করতে করতে আপনার কথা ভাববার অবকাশ তেমন পাই নি। নইলে সকালেই যখন ভামতীর মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলেন, তখনই অনুমতি আমার দেওয়া উচিত ছিল।"

ওর চোখের দিকে একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, বললাম, "তা হলে অনুমতি এখন দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি ভাই, কিন্তু এ কথাটা যেন পাঁচ কানে না যায়!"

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "তা যাবে না, যদি তুমি 'আপনি-আজ্ঞে' ছেড়ে এর পর ওই 'ভাই' সম্বোধনের ফলস্বরূপ 'তুমি'তে এসে সত্যিই নেমে দাঁড়াও।"

হেসে বললে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

কাছেই একখানা মাটির ঘর। দরজার কড়া নাড়তেই একটি বুড়ী ঝি এসে দরজা খুলে দিল, চেট্টিবাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল সে।

ঘরের মেঝে পাকা, কিন্তু দেওয়াল মাটির, সাদা রঙ করা। মাথায় তালপাতার ঘন ছাউনি। ঘর অবশ্য মাত্র দুখানা। বাইরের ঘর, অর্থাৎ যেটাতে নটরাজন থাকে, সেটা একটা প্রকাণ্ড তক্তাপোশে ভর্তি, তার উপরে পাতা বিছানা, বিছানার উপরে বই, খাতাপত্র, একটা মৃদঙ্গম্, গোটাকয়েক বাঁশের বাঁশী, একটা হারমোনিয়াম, এই সমস্ত শোভা পাচ্ছে নিতান্ত আগোছালো ভঙ্গিতে।

এই ঘরখানা পার হয়ে একটি দাওয়া, দাওয়ার পরে ক্ষুদ্র এক বাঁধানো উঠোন, উঠোনে ঠিক ও-বাড়িতে যেমন দেখেছিলাম, তেমনি দুটি লৌহদণ্ডে ঝোলানো একটি দোলনা। উঠোনে বা দোলনায় কেউ কোথাও ছিল না, শুধু যে বুড়ী ঝিটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এসে দাঁড়াল দাওয়ার এক পাশে। আমরা উঠোন পার হয়ে যে ঘরখানায় গিয়ে পৌঁছলাম, সেটাতেই শুয়ে ছিলেন মহিলাটি, ছোট্ট একটা খাটে। পায়ের কাছে বসে আছে ভামতী, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে সে মায়ের মুখ থেকে।

আমাদের দেখে সে মুখ ফেরাল, চেট্টিবাবুর পিছনে পিছনে যে আমি গিয়ে উপস্থিত হব, এ সে ভাবতেও পারে নি। বিপুল বিস্ময় নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

চেট্টিবাবু মহিলাটির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকলে, "সরস্বতী আম্মা!"

ধীরে ধীরে ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, ঠোটের কোণে সামান্য একটু হাসির আভাসও ফুটে উঠল, অতি ক্ষীণ স্বরে কোনক্রমে যেন বলে উঠলেন, "চেট্টি?"

"হ্যাঁ, আমি। কেমন আছ?"

ঠোঁটের কোণের হাসিটা এবার ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে, কোনও কথা বললেন না, শুধু ম্লান একটু হেসে চোখ দুটো বুজলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণের জমা অশ্রুবিন্দু দুটি ধারা বেয়ে দুটি গালের উপরে নেমে এল।

চেট্টিবাবু মুখ ফেরালেন ভামতীর দিকে, বললেন, "ডাক্তার এসেছিল এ বেলা? কী বলে?"

দুটি বড় বড় চোখের দৃষ্টি চেট্টিবাবুর উপরে মুহূর্তের জন্য ফেলে চোখ দুটি নামিয়ে মুখ নত করল সে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল চেট্টি, বললে, "বুঝেছি। আমি বড় ডাক্তারকেও আনবার চেষ্টা করছি কাল সকালে। আসল কথা, ওষুধ ইনজেকশন—এসব তো পড়েছে, এখন ভালমতো নার্সিং দরকার।"

ভামতী বললে, "আমি তো করছি সাধ্যমতো।"

"করতেই হবে।"

ভামতী বললে, "মার যতদিন কিছু না হয়, এখানেই থাকব তো?"

চেট্টিবাবু একমুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললে, "তাই থাকবে। তোমার ও-বাড়ির ঘরে আপাতত স্থান হয়েছে ভারাহালুর।"

"কেন? ভারাহালুর ঘর কী হল?"

"সে ঘরে পাকাপাকিভাবে এসে বাস করছে এখন সরোজা।"

"সরোজা!"

"হ্যাঁ। ঘনশ্যামদাসজী তাকে ত্যাগ করেছেন। এবং সেও তার পুরনো জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে না।"

"কেন?"

"কেন! তাকেই একদিন জিজ্ঞাসা করো।"

ভামতী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হঠাৎ আমাকে নির্দেশ করে চেট্টিবাবুকে বলে উঠল, "ইনি?"

"ইনি? আমাদের বাবুজী?' চেট্টিবাবু একমুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, তারপরে ভঙ্গি পরিবর্তন করে সহজভাবে বলে উঠলেন, "ইনি এসেছেন তোমার মায়ের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। আমিই নিয়ে এসেছি। মনে হয়, ইনি নিয়মিত দেখাশোনা করলে রোগীর নার্সিং বা চিকিৎসা ভালই চলবে। নটরাজন এক পাগল লোক, তার ওপরে কাজকর্মের ব্যাপারে খুব নির্ভর করা যায় কী? এঁর ওপরে যথেষ্ট নির্ভর তুমি করতে পারবে আশা করি।"

ভামতী মাথা নিচু করে রইল, কিছু বলল না।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল চেট্টিবাবু, "তা হলে বাবুজী, আমি চলি। তোমার ওপর এদের সব ভার দিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন?"

বললাম, "সাধ্যমতো বইবার চেষ্টা করব।"

চেট্টিবাবু একটু হেসে, তারপরে সত্যিই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি ভামতীর দিকে ততটা নয়, যতটা লক্ষ্য করছিলাম তার মাকে। কপালের উপরে সিঁথির কাছে এবং কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে, দুটি চোখ বসা, গালে কপালে চোখের কোণে কুঞ্চনের রেখা, সমস্ত দেহটা কঙ্কালসার, শীতের পার্বত্য জলধারার মতো বিশীর্ণ পড়ে আছেন যেন পাষাণের বন্ধনে, কিন্তু তবু মনে হল, অপার্থিব এক সৌন্দর্যের জ্যোতিরেখা এঁকে রেখেছে কে যেন অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণ পটভূমিকায়।

এ-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণও করা যায় না, এ-সৌন্দর্যের কথা বলেও বোঝানো যায় না, এ জিনিস ধরা পড়ে মাত্র অনুভূতিতে।

কিন্তু অনুভূতি? পৃথিবীর মাটি আর পাথর নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে অকস্মাৎ এ অপার্থিব অনুভূতির স্পর্শ জাগলই বা কেমন করে?

চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ভামতীর দিকে। ওর চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর বোধ হয় কাটে নি, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে চোখে মিলে যেতেই বললে, "এলে কেন এখানে?"

বললাম, "খুবই অবাক হয়েছ, না?"

নিম্নকণ্ঠে প্রায় ফিস ফিস করেই বললে, "চেট্টিবাবুকে জয় করলে কেমন করে, তাই ভাবছি।"

"তার মানে! এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসছে কেন?"

"আসছে। তুমি জান না, চেট্টিভাইয়া কোন মেয়ের কাছে কোন বাইরের পুরুষকে কখনও অনর্থক মিশতে দেয় না।"

বললাম, "আমি কী বাইরের পুরুষ?"

"নাও !"

একটু থেমে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "হয়তো তাই। কিন্তু তা বলে—"

বাধা দিয়ে বলে উঠল, " 'কিন্তু'-টিন্তু নয়, ওদের চোখে তুমি তা-ই, বাইরের লোক।"

একটু হেসে বললাম, "চেট্টিবাবুকে নির্বোধ মনে কোর না, সে ঠিক বুঝেছে।"

"কী বললে !" যেন আর্তনাদ করে উঠল ভামতী: "বুঝতে পেরেছে ওরা সব ?"

" 'ওরা' বলতে কী বোঝাতে চাও জানি না, তবে চেট্টিবাবু সমস্তই আন্দাজ করতে পেরেছে।"

"নটরাজন ?"

"সে হয়তো নয়, কিন্তু ক্রমশ সেও পারবে জানতে।"

চুপচাপ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল ভামতী।

বললাম, "ভয় পাচ্ছ কেন ? জানাজানি হলেই বা !"

"না না, জানাজানি হওয়াটা ঠিক নয়। এর ফল ভাল হয় না।"

"তা হলে, কী করবে এখন ?"

বলে উঠল, "বাধা দেব।"

বললাম, "কাকে ? আমাকে ? আমার এখানে আসাটা তুমি রোধ করতে পারবে ?"

হঠাৎ মুখের উপর দুটি হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

"এ কী ! কাঁদছ কেন ?"

বললে, "আমি চাই না তুমি এখানে আস। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই বা মাকে আমার দেখবে কে ? চেট্টিভাইয়া ব্যস্ত মানুষ, আর নটরাজন ? সে অন্য জগতের মানুষ, সে খেয়ালী। চেট্টি-ভাইয়া সত্যি কথাই বলেছে, তুমি ছাড়া নির্ভর করার মতো অন্য কেউ আমার নেই।"

একটু থেমে তারপরে বললাম, "বেশ। তোমার মায়ের ভার আমি নিলাম। আর তুমি যা ভয় করছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার-আমার সম্পর্ক নিয়ে কেউ যাতে কিছু মনে করতে না পারে, সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি থাকবে।"

আমার কথায় কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হল ভামতী, বললে, "চেট্টি-ভাইয়া যখন জানতে পেরেছে, জানুক। তার কাছ থেকে অন্য কেউ কখনও কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু অন্য কাউকে যেন আর বুঝতে দিয়ো না। তাদের নিজেদের বহু ব্যর্থতার ইতিহাস আছে, তারা চেট্টিভাইয়ার এই প্রশ্রয়ের কথাটা জানতে পারলে তারই কাছে গিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে।"

সামান্য একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে উঠলাম, "তোমার ইঙ্গিতটা কি নটরাজনকে লক্ষ্য করে?"

"হ্যাঁ, কতকটা তাই।"

বললাম, "ওরও কি আছে কোন ব্যর্থতার ইতিকথা?"

বললে, "থাকতে পারে। নইলে এমন করে পড়ে আছে কেন এ পল্লীতে? কী স্বার্থ ওর এখানে?"

বললাম, "সেটা আমি জানি। নৃত্যশিল্পী আর গায়িকা গড়ে তুলতে চায় তোমাদের মধ্য থেকে।"

বললে, "কে জানে! কিন্তু আমার মনে হয় আরও যেন কিছু আছে ওর ভেতরে। কী এক দুঃখ থেকেই বুঝি ওর এই শিল্পী-মনের জন্ম! প্রতিটি সৃষ্টির মূলেই তো থাকে গভীর কোনও বেদনা। নয় কী?"

বললাম, "এটা তুমিই বা বুঝলে কী করে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "তা আমি পারি বুঝতে। আমার শিক্ষাগুরুই বল আর দীক্ষাগুরুই বল, সে এই আমার মা।"

নির্জীবের মত বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন মহিলাটি। চোখ দুটি বোজা, যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

বললাম, "চিকিৎসা তো ভালই হচ্ছে, কী বল?"

বললে, "তোমার কি তাই মনে হয়? ইনজেকশন তো দিয়ে গেল, আরও নাকি নিতে হবে।"

"খাওয়ার ওষুধ?"

"এই যে শিয়রের কাছে, টেবিলটার উপরে।"

"কী বলেন ডাক্তার?"

"অবস্থা ভাল নয়। সারারাত জাগতে হবে। হাত-পা ঠাণ্ডা না হয়ে আসে।"

বলতে-না-বলতেই কেঁদে ফেলল ভামতী: "মা যে আমার কতখানি, তা তোমরা বুঝবে না। সব শিখেছি, সব জেনেছি এই মায়ের কাছ থেকে। এই মা যদি—"

বাধা দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে উঠলাম, "এত কাতর হয়ো না। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে, ঠিকমতো সেবা-শুশ্রূষা হলে—দেখতে-না-দেখতেই সেরে উঠবেন উনি।"

দুটি চোখ আমার উপর স্থাপিত করে বললে, "আমার বড্ড ভয় করছে। আমি যে পাপ করেছি।"

"কী পাপ?"

বললে, "ওই নবগ্রহমূর্তি বড় জাগ্রত। ওঁদের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা, করেছিলাম কাউকে ফুলের নাম বলব না বা কাউকে নিজের নাম বলে দেব না।"

"অথচ আমাকে বলে দিয়েছ, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

বললাম, "তাতে কোনই পাপ হয় নি।"

"বলছ কী তুমি!"

"ঠিকই বলছি। কে আমি তোমার? আমাকে না বলে তুমিই বা থাকতে কেমন করে?"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপরে স্থানকাল ভুলে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "তুমি বুঝতে পেরেছ তা?"

কী জানি কী হল, আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললে, "জান, মাকে তোমার কথা বলেছি।"

ফিরলাম ওর দিকে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কী বলেছ!"

"নাই বা শুনলে?"

"দোষই বা কী শুনলে?"

বললে, "অন্তরে সাত্ত্বিকভাব, বাইরে অন্য-কিছু, এ-রকম 'কবি' পুরুষের বর্ণনা মায়ের কাছ থেকেই শুনেছিলাম।"

একটু হেসে ওর কাছে সরে গিয়ে বললাম, "তা-ই হয়েছে। মায়ের কাছে এসব শুনে শুনে একটা কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছ মনে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাও সবাইকে। আর যাই কর, আমাকে ওসব কিছু কল্পনা কোর না, ঠকবে।"

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, "না, ঠকব না।"

বলেই মায়ের শিয়রে গিয়ে বসে পড়ল, ধীরে ধীরে ওঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "মা বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। তুমি এখন যাবে না?"

এক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, "যাব বলে তো আসি নি। থাকব।"

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর দুটি চোখ, একটু যেন ভয়, একটু যেন শঙ্কাও জেগে উঠল সে দৃষ্টিতে, বললে, "তুমি থাকবে! মানে?"

বললাম, "বাইরের ঘরটা তো নটরাজনের। সে দেখেই বুঝেছি। তোমার ঘর কোন্‌টা?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমার আবার ঘর কোথায়! মায়ের ঘরই আমার ঘর।"

"রাত্রে শোবে কোথায়?"

বললে, "সে ওই পাশের ঘরখানায়।"

"তা হলেই হবে। আমি থাকব এ ঘরে। একজন কেউ ওঁর শিয়রে জেগে না থাকলে চলবে না।"

তেমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বললে, "রাত জাগার জন্য তো আমিই আছি, তুমি কেন ?"

বললাম, "সঙ্গে আর-একজন থাকলে দোষ কী ?"

ধীরে ধীরে নিচু করল মুখ, তৎক্ষণাৎই কোনও উত্তর দিল না। তারপর চোখ দুটি যখন তুলে ধরল, দেখলাম, দুটি চোখই অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেছে, বললে, "ভিতরে ভিতরে বুক কাঁপছে আমার দারুণ ভয়ে, যদি কিছু হয় ? আমার পাপের শাস্তি যে এমন ভাবে নেমে আসবে, তা আমি কখনও ভাবি নি।"

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, "তুমি সর। মায়ের শিয়রে বসে অনর্থক কেঁদে কেঁদে ওঁব ঘুমটা ভেঙে দিয়ো না।"

হয়তো কান্নার আবেগটা শান্ত করবার জন্যই উঠে দাঁড়াল। তারপর মাকে যেন আমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে।

একটু ঝুঁকে মহিলাটির মুখের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম ভাল করে। মনে হল, এ ওঁর ঠিক ঘুম নয় অথচ অজ্ঞানও হয়ে যান নি, কেমন যেন আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। জ্বর খুব বেশী হবে না, বুকের ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের ব্যথায়ও ওঁকে তেমন কাতর মনে হচ্ছে না। পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, পাও ঠাণ্ডা নয়। অথচ এমনভাবে পড়ে আছেন কেন ?

মনে একটা প্রশ্ন নিয়েই শিয়রে বসে ওঁর মেয়ের মত হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম মাথায়। নীরবেই কাটতে লাগল সময়। কেরোসিনের উজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্পটা ঘিরে একটা জ্যোতির্বৃত্ত ঘরখানার বাকী অংশে আলো-আঁধার অদ্ভুত এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

কিছুক্ষণ পরেই এল ভামতী। সে দ্রুতপায়ে মায়ের বিছানা পর্যন্ত এসে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চলার গতি দিল থামিয়ে। ইঙ্গিতে জানালাম, কাছে এস।

বললাম, "ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে নাকি ? রাত এখন সাড়ে আটটা।"

"তাই নাকি ! কিন্তু মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে ! ঘুম ভাঙানো কি উচিত হবে ?"

বললাম, "ঘুম কী ? আমার তো মনে হয় না। তুমি একবার ডাক দেখি ?"

বেশীক্ষণ ডাকতে হল মা ভামতীকে, ওঁর কপালে হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে বার কয়েক ডাকতেই যেন দূর থেকে সাড়া দিয়ে উঠলেন তিনি ; যেন সুদূর কোন জগৎ থেকে উত্তরণ করলেন এই জগতে। ভামতী ওষুধটা খাইয়ে দেবার পর ওঁর হুটি বিহ্বল দৃষ্টি যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হল।

"কী খুঁজছ মা ?"

হুটি চোখ অবশেষে স্থাপিত হল আমার উপর, ধীর কণ্ঠে বললেন, "নটরাজন ?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওঁর মেয়ে, "না মা, এই সেই বাঙালী ভদ্রলোক। তোমার সেবা করতে এসেছেন।"

স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে বৃদ্ধার হুটি চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে সস্নেহ হাসি, আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, "সেবা ! না। কারুর সেবা আমাদের নিতে নেই। আমরা দেববধূ।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুজে গেল চোখের হুটি পাতা, ঠোঁট হুটি কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। অবশ্য আশঙ্কার কিছু নয়, তাড়াতাড়ি হাত টেনে দেখলাম, কপালে হাত রেখে দেখলাম। অবস্থার তারতম্য বিশেষ কিছুই হয় নি, বরং জ্বরটা কমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়া, এও যেন কেমন স্বাভাবিক ঠেকছে না।

ভামতী বললে, "ঘুমিয়ে পড়ল, না ?"

"তাই কী ?"

"হ্যাঁ, এভাবেই তো ঘুম আসছে ওর।"

বললাম, "অবস্থা অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু ঘুমটা? তা হবে। হয়তো ঘুমই হবে। আমারই বোঝাবার ভুল।"

বলে, আর একবার পায়ে হাত দিলাম। না, পাও ঠাণ্ডা নয়।

ভামতী বললে, "শোন।"

"কী?"

"খেয়ে তো আস নি।"

"কী আশ্চর্য, এখন কি সে প্রশ্ন করার সময়?"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললে, "মেয়ে হয়ে জন্মেছি যে! বল না গো? আর বলবেই বা কী, মুখ দেখেই বোঝা যায়। ও-ঘরে এসো তো চট করে, আসন পেতে রেখে এসেছি, দুটি মুখে দিয়ে নাও।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, বললাম, "আশ্চর্য তোমরা! আমি বলি, থাক্ ওসব, হোটেল থেকে এখুনি খেয়ে আসছি।"

খপ করে আমার হাতটা ধরল, বললে, "না। যেতে হবে না।"

বললাম, "আচ্ছা পাগল তো!"

"কেন! পাগলটা কিসে দেখলে?"

"এই একটু আগে বলছিলে, তুমি যাবে না। আর এখন না-যেতে দেওয়ার মতলব!"

ও কিন্তু এ পরিহাসের সুরে যোগ দিল না, মুখ নত করল, গম্ভীর ওর মুখ।

"কী হল!"

দুটি আয়ত চোখের করুণ দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত করে বললে, "খাবে না?"

চোখের ভাষায় গলার স্বরে এমন এক মিনতি ছিল যে, আমি আর 'না' করতে পারলাম না। বললাম, "আচ্ছা, চল। কিন্তু মায়ের কাছে থাকবে কে?"

"আমিই থাকব। তোমাকে বসিয়ে দিয়েই চলে আসব।"

পাশের ঘর। ঘরখানা লম্বায় ও-ঘরখানারই সমান, পরিসরে ছোট। দরজার কাছেই একটা নেয়ারের সাদা ফিতে-বোনা খাটিয়া, তার পাশে কয়েকটা বাক্স উপরে-উপরে সাজানো, আর ঘরের বিপরীত অংশ জুড়ে ঠাকুর-পূজার নানাবিধ উপকরণ। ধূপ-ধুনো, ঝকঝকে পিতলের পিলসুজের মাথায় প্রদীপ জ্বলছে, জলচৌকির উপর চতুর্ভুজ নারায়ণের বেশ বড় একটা ছবি বসানো—দেওয়ালে হেলান দেওয়া, সেই ছবির উপরে চন্দনের ফোঁটা, পায়ের কাছে ফুলের রাশি।

কী আকর্ষণে যেন এগিয়ে গিয়েছিলাম ছবিটার কাছে। দেওয়াল ভরে নানান ঠাকুর-দেবতার ছবি, নানান তীর্থেরও ছবি। কিন্তু সব থেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল যেটা সে হচ্ছে একজোড়া পায়ের ঘুঙুর—নারায়ণের মূর্তির পাশেই রাখা আছে ভিন্নতর ছোট্ট একটা জলচৌকির উপরে। দেখেই বোঝা যায়, বহু পুরনো, কিন্তু যত্নের অবধি নেই, তারও উপরে চন্দনের ফোঁটা, ফুলের অঞ্জলি, দুটো জল-চৌকিতেই আলপনা আঁকা।

কতক্ষণ ধরে এই সমস্ত নিরীক্ষণ করছিলাম মনে নেই, পিছন থেকে ভামতী এসে চুপিচুপি বলল, "কী দেখছ?"

বললাম, "এটা যে তোমার মায়ের পূজার ঘর, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু—"

"থমলে কেন, বল?"

বললাম, "ঠাকুরের পাশে ওই ঘুঙুরটা কিসের? ওটারও কী পূজা হয়?"

বললে, "হয়। আমাদের নিয়মকানুন সব তোমরা বুঝবে না।"

"অন্তত চেষ্টা করছি বুঝতে।"

একটু ইতস্তত করে বললে, "মাও ছিলেন আমার মত দেববধূ। সে তো শুনেছ? দেবতার মন্দিরে জীবনের প্রথম নৃত্য মা করেছিলেন ওই ঘুঙুর পায়ে দিয়ে, সেইজন্যই ওই ঘুঙুর ওভাবে রেখে দিয়েছেন মা, পুজোও করেন।"

"জীবনের প্রথম নৃত্য মানে?"

বললে, "আমাদের একটি মেয়ে—ভারাহালু—সে শীগগিরই তার জীবনের প্রথম নৃত্য প্রদর্শন করবে মন্দিরে। তোমাকে নিয়ে যাব, দেখো'খন নিজের চোখে। নাচ শেখবার পর, প্রথম নাচ দেখাতে হয় দেবতার কাছে—দেবতার মন্দিরে।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। নাচটাকে আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবের একটা বিকাশ বলে মনে করি। ক্রমে ক্রমে তুমি সবই জানতে পারবে। এখন খাবে এস।"

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি স্থান নিলাম বৃদ্ধার কাছে। বললাম, "তুমি শোও গিয়ে, আমি জেগে আছি।"

ও বললে, "তা কি হয়!"

"হয়। যাও দেখি তুমি।"

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে, বললে, "সত্যিই জেগে থাকবে! কেন?"

"এমনি। খেয়াল।"

আমার মুখের দিকে তাকাল, বললে, "খেয়াল নয়, আমি বুঝতে পেরেছি, কেন।"

কেমন যেন অদ্ভুত গম্ভীর আর কঠিন দেখাল ওর মুখ। আশ্চর্য হয়ে বললাম, "বলতে চাও কী তুমি?"

নির্মম কণ্ঠে বললে, "আজ ও-বাড়ি যাও নি?"

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছি লক্ষ্য করে বললে, "অন্য মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে এলেও তো পারতে!"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে একটু হেসে বললাম, "হ্যাঁ, তা পারতাম। কিন্তু পারলাম না।"

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। মায়ের পায়ের কাছে বসে ও। শিয়রে আমি। এক সময় বলে উঠল, "মাকে খাইয়ে দিই এবার?"

বললাম, "হ্যাঁ, তা দেওয়া উচিত। কিন্তু এমন নিঃঝুমের মতো পড়ে আছেন কেন বুঝছি না।"

মাকে ডেকে ও বোধ হয় সাগু কি বার্লি খাওয়াল এক বাটি। এবারেও চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে আমার উপর দৃষ্টি স্থাপিত করলেন: "নটরাজন?"

ভামতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সে এখনও আসে নি। এ সেই বাবুজী।"

"বাবুজী!" বৃদ্ধা একটু হাসলেন, কোমল কণ্ঠে বললেন, "আমি ভাল আছি। রাত অনেক, না? তোমরা শুয়ে পড়গে।"

পরক্ষণেই বাইরে একটা কলরব শোনা গেল, দাওয়ায় শুয়ে থাকা সেই ঝিটির কণ্ঠস্বর। তারপরে খিল খোলার শব্দ, কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠোন পার হয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল নটরাজন, আমাকে দেখে বোধ হয় একটু অবাকই হয়ে গেল সে, বললে, "যান নি বাবুজী?"

একটু হেসে বললাম, "না তাড়ালে যাব না। থাকব।"

"ছি-ছি, এ কী বলছেন! এ আমাদের সৌভাগ্য।"

ভামতী বলে উঠল, "খাওয়া হয়েছে?"

নটরাজন বললে, "হ্যাঁ। ও-বাড়ি থেকে। সরস্বতী আম্মা কেমন?"

ততক্ষণে আচ্ছন্নের মত হয়ে গেছেন বৃদ্ধা, নটরাজন কাছে এসে ওঁকে ভাল করে দেখল, তারপরে বললে, "আপনারা রইলেন, তেমন কিছু বুঝলে আমাকে ডাকবেন। কেমন?"

"আচ্ছা।"

যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল নটরাজন।

তারপরে কাটতে লাগল সময়। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রহরের পর প্রহর।

ভামতী মায়ের পায়ের কাছে ঘুমে ঢুলে-ঢুলে পড়ছিল, একসময় বললে, "ঘুম পাচ্ছে না তোমার?"

"না।"

"শোবে না?"

"না।"

"না আবার কী? ও-ঘরে বিছানা করেছি। শোও গিয়ে।"

"না।"

সোজা হয়ে উঠে বসল এবার, বললে, "মা তো ঘুমুচ্ছে। ঘরে ঝিও তো রয়েছে। তুমি ঘুমোও গিয়ে।"

ইতিমধ্যে অবশ্য সেই বুড়ী ঝিটি এসে ঘরের এক পাশে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়েছিল, সেও আচ্ছন্ন নিবিড় ঘুমে। বললাম, "বরং তুমি গিয়ে ঘুমোও।"

এবং এরই উত্তরে হঠাৎ সে বলে বসল অদ্ভুত একটা কথা, বললে, "তুমি আগে যাও বিছানায়, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"তার মানে!" অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই ধরতে পারলাম ওর ইঙ্গিত, বুঝতে পারলাম কী ভয়ানক কথা ও বলতে চায়!

মুহূর্তে যেন সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল। কী জঘন্য পশুই না ও ভেবেছে আমাকে! মনে হল, এখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাই।

পরক্ষণেই মনে হল, এ চিন্তা করে অন্যায় ও কিছু করে নি। ওর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র কী? হঠাৎ কী-এক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যে-ভাবে প্রথম গিয়েছিলাম ওর ঘরে, তাতে করে আমাকে নিছক দেহবাদী ছাড়া সত্যি-সত্যি আর কী ভাবা উচিত ওর পক্ষে? অন্তত নিজের উপরেও আমার সেই ধারণা। কিন্তু, ও-ই আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছে অন্য এক ভাবের প্রবাহ, যাতে অনুক্ষণ অবগাহন করে চলেছি, মনে হচ্ছে, এই যা দেখছি, এই যা করছি, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, এর বাইরেও এক রসের জগৎ আছে, এক আনন্দের বিশ্ব বর্তমান।

অবশ্য, কে জানে, এ মাত্র কল্পনাবিলাস কি না, ওরও—আমারও ?

তাই ওর কথার উত্তরে একটু হেসেই বললাম, "বেশ। তুমি শোও গিয়ে আগে। আমিই বরং যাচ্ছি একটু পরে।"

সত্যি-সত্যি উঠে দাঁড়াল ভামতী, ছুটি ঘুম-ঘুম চোখের দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত করে বললে, "দেরি কোর না, ভোরে উঠতে হবে আমাকে।"

চলে গেল পাশের ঘরে।

আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না এ পরিস্থিতির জন্য।

প্রথমে মনে একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা এলেও, পরে মনে হল, ক্ষতি কী ? বৃদ্ধা অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন, রাত্রিও শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছে, অখণ্ড নিস্তব্ধতা চারিদিকে, এ সময় মূর্তিমান পাপের মত ভামতীর কাছে গেলে, অন্তত ভামতীর অনুমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

কবি ! বিশ্বরহস্যের সর্বত্র যে চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই নাকি কবি ! আমি যে ওর অনুমান মত সত্যিই 'কবি' নই, তার প্রমাণ দেব ঠিক এই মুহূর্তে ওর কাছে গিয়ে লালসার বহ্নিতে বহ্নিমান হয়ে। পড়ে থাক্ রোগিণী এক পাশে, দূরে থাক্ সমস্ত সুকুমার অনুভূতি। বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ওই আচ্ছন্নভাব দেখে যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে মন নিবিড় হয়ে উঠছিল, তা থেকে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জানলার বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা একটা গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া ভেসে আসছে। জানলায় ঝুঁকে হাওয়ার কাছে মাথাটা রেখে একটু যেন স্নিগ্ধ হল মন, তারপরে ধীরে ধীরে গেলাম পাশের ঘরে ভামতীর কাছে।

দেবমূর্তির-কাছে-রাখা সেই প্রদীপটি কখন নিবে গেছে, সেই নেয়ারের খাটটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে ভামতী,—ঘুমের ঘোরে বেশবাস এলোমেলো, বুকের আঁচলটা লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

কয়েক মুহূর্ত ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে এল অন্য এক ভাব।

মনে হল, নিশীথ রাত্রে বিশ্বসংসার যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারও এক রূপ ফুটে ওঠে। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এ যেন ঘুম নয়, কোন এক কৌতুকময়ী যাদুকরী যেন তার মা[illegible]ল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সবাইকে।

পাশের ঘর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যেটুকু আলো এসে পড়েছে এই ঘরে, সেই আবছা আলোতেই ভামতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, কী নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাতেই না ও এসে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছে!

কিন্তু আশ্চর্য ওর আহ্বান! আমাকে যে অমন করে ডেকে এল, সে কি এই ভামতী? বিশ্বাস হয় না। যে ঘুমিয়ে আছে, ও আর-এক মেয়ে, আর-এক জগতের মেয়ে আর-এক অনুভূতির মেয়ে। একে ছোঁয়াও যায় না, বোঝাও যায় না।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম ওর কাছ থেকে। ফিরে এলাম ওর মায়ের কাছে। ঠিক তেমনি একই ভাবে পড়ে আছেন বিছানায়, আলো-কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে আলো-আঁধারে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করেছে।

আমার চোখে মৃত্যুমাত্র ঘুমের ছোঁওয়া নেই, কী এক অনুভূতির আবেশে দেহমন আচ্ছন্ন। মহিলাটির শিয়রের কাছে যে খোলা জানলাটি দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে জনপদ-প্রান্তের বিস্তৃত পর্বতমালা চোখে পড়ল। রাত গভীর বলে রাস্তার আলো বোধ হয় 'মনুষ্যপালসমিতি'র লোকেরা নিবিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, অরণ্যচারী হস্তীযূথের মত দেখাচ্ছিল পাহাড়গুলো। মনে হচ্ছিল, বহু মত্ত মাতঙ্গ যেন একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই এক কোণে, পর্বতচূড়ার অনেক নীচে, বলা যায় পাহাড়ের কোলে—সাদা-সাদা দেখাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটা। বোধ হয় এখনও আলো জ্বলছে মন্দিরে, কান পেতে শুনলে, বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে-আসা কোন সঙ্গীতমূর্ছনার রেশও অনুভব করা

যায়; নিশীথ রাত্রে হয়তো নাচ আর গানের আরতি করছে দেবদাসীরা। আর যারা দেববধূ, তারা নেই মন্দিরে, একজন তো ঘুমিয়েই আছে পাশের ঘরে।

কী একটা অস্ফুট শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে ছুটে এলাম মহিলাটির কাছে। বোধ হয় ঘুম ভেঙেছে। হাত দুটি ওঠাবার চেষ্টা করছেন, ঠিক পারছেন না, ভয়ানক কাঁপছে দুটি হাত। বালিশ থেকে মাথাটাও ওঠাবার চেষ্টা করেছেন, তাও পারছেন না, চোখ দুটি বিস্ফারিত।

আমি চট করে ভামতীকে ডেকে আনব কি না ভাবছি, হঠাৎ ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বিস্ফারিত সেই চোখের দৃষ্টিতে ভয়ও নেই, আতঙ্কও নেই, অদ্ভুত এক আনন্দের জ্যোতিতে সমস্ত মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে। মনে হল, ক্ষীণ কণ্ঠে কী যেন বলছেনও তিনি।

তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মেঝের উপরে। খাটের কিনার ধরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওঁর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, চোখের দৃষ্টি শূন্যে কী এক অশরীরী উপস্থিতিব দিকে স্থির নিবদ্ধ, অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগে বুঝি ধারাও নেমেছে চক্ষু বেয়ে, বলে চলেছেন, "তুমি এসেছ! আমাকে নেবে সঙ্গে করে? নাও, আমাব হাত ধরে নাও।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হচ্ছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি না, উনি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছেন কাউকে ওঁর সামনে।

বলে উঠলেন, "এক হাতে তোমার গদা, অন্য দুই হাতে শঙ্খ আর চক্র। চতুর্থ যে হাতটিতে তোমার পদ্ম, সেই হাতটি ধরে আমাকে তুলে নাও তোমাব কাছে।"

বার বার উনি বলতে লাগলেন এই কথাটা। জ্বরের-ঘোরে-ভুল-বকা ব্যাপারটা আমার দেখা আছে, এটা ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। জ্বরও তো বেশী নয়, অথচ —

অথচ ব্যাপারটা যে কী, তা বুঝেও বুঝতে পারছিলাম না। ভক্তিমতী নারী চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন পেয়েছেন, এ-কথাটা সেই মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করলে ভাল হত, সহজ হয়ে যেত ব্যাপারটা। কিন্তু এ-যুগের লোক আমি, এ-যুগের বস্তুবাদের ভাবধারায় লালিত, চট করে 'অলৌকিক' বলে মনে করব কেন সব-কিছুকে?

উনি দেখছেন, কিন্তু আমি তো দেখছি না কিছুই! তবে এ কী কোন মানসিক বিকার? তাও মেনে নিতে মন রাজী হচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে কেমন একটা ভয় হতে লাগল মনে। উনি বার বার বলছেন, "তুমি এস নাও আমাকে।"

আর আমার মনের গহন কন্দরে কী অদ্ভুত যেন এক সুর উঠছে, বলছে, "আমাকেও নাও। গ্রহণ কর আমাকে রসের রাজ্যে।"

যেন হাহাকার করে বলতে চায় আমারই ভিতরকার আর-এক মন,—আমি ভূতত্ত্ববিদ, সম্পূর্ণ বস্তুবাদী সাধারণ একটি লোক,—কিন্তু আমাকে তুমি পরিবর্তিত করে দাও। আমি তোমার এ সুন্দর রাজ্যের প্রতিটি সুন্দর কণাও যেন দেখতে পারি! 'কবি' করে দাও তুমি আমাকে।

—কবি!

কথাটা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুতের মত চমক দিতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। অদ্ভুত এক আতঙ্কের অনুভূতি এল মনে। বৃদ্ধাটির ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা নিজের নিভৃত মনের প্রতিধ্বনি শুনে।

একপ্রকার ছুটেই চলে এলাম পাশের ঘরে। অন্য কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না, দরজার কাছ থেকে ডাকতে লাগলাম, "ভামতী—ভামতী!"

সাড়া নেই। ভিতরে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সেই আলুলায়িত-কুন্তলা ঘুমন্ত নারী-শরীরের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে ওর মাথায় হাত দিয়ে ডেকে উঠলাম, "ভামতী!"

"উঁ!" বলে ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল।

বাহুমূলে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলাম, "এই, শীগগির ওঠ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধড়মড় করে উঠে বসল ভামতী: "কী! কী হয়েছে!"

"তোমার মা—"

"মা! কী হয়েছে মায়ের?"

বলতে-না-বলতেই কোনক্রমে আঁচলটা সামলে তাড়াতাড়ি এ-ঘরে ছুটে এল ভামতী। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"মা! মা!"

যেন অঘোর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করলেন বৃদ্ধা, ভামতীকে দেখে অপূর্ব স্নেহের ভাবে ভরে গেছে মুখ, বললেন, "কী মা ভামতী?"

যেন অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন তিনি, ব্যাধির কোন গ্লানি, কোন বিকার তাঁকে যেন আর ছুঁয়ে নেই।

"ভাল আছ?"

ঠোঁটের কোণে তেমনি প্রসন্ন হাসি, বললেন, "আছি।"

"কষ্ট হচ্ছে কোনও?"

"না।"

আমার দিকে চোখ ফেরাল ভামতী, চোখের ভাষায় নীরবে প্রশ্ন করলে, "কী? ভয় পেয়েছিলে কেন?"

বৃদ্ধা জল চাইলেন এ সময়।

ভামতী ওঁকে জল খাইয়ে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগল নীরবে। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ওঁর মেয়ের সাহায্যে থার্মোমিটার লাগিয়ে শারীরিক উত্তাপ নিলাম, সামান্য একটু জ্বর রয়েছে মাত্র। বুকে বেদনা শ্বাসকষ্ট যেন কিছু নেই। ধীর ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়ের সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি।

একসময় মেয়ে ডাকল আমাকে, বললে, "এস, মা ডাকছে।"

আমি খুব কাছে এসে বসতেই সস্নেহে তাকালেন আমার দিকে, একখানা হাত উঠিয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদও করলেন

মনে হল যেন। বললেন, "ভাব আছে তোমার মধ্যে। ভাবী হয়ো।"

কথাটার তাৎপর্য সেদিন বুঝি নি। কিন্তু বৃদ্ধার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম

মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আলোটা চোখে না লাগে, এইজন্য কমিয়ে দিয়ে ঘরের অপর জানলাটির কাছে একটা ডেকচেয়ার পেতে দিল ভামতী, বললে, "এস, এখানে বসবে এস।"

নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে কাছেই বসল। বললে, "রাত আর বেশী নেই, বাকী রাতটা গল্প করে কাটাবে, না, ঘুমবে? আমি বলি, ঘুমিয়ে নাও বরং।"

ডেকচেয়ারে তলিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে নিজেকে। ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

আমার বাহুতে একটা নাড়া দিয়ে বললে, "ও-ঘরে চল। ঘুমবে।"

সংক্ষেপে বললাম, "ঘুম আসবে না।"

"অর্থাৎ গল্প করবে, এই তো? বুঝেছি।"

আমি চুপ করে রইলাম। ও একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করল, "তখন আমার কাছে এলে না কেন, ও-ঘরে?"

চুপ করেই আছি।

ও বললে, "জানি, আমি ডাকলেও তুমি তখন আসতে পারতে না। আমি জেনে শুনেই ডেকেছিলাম। অন্য লোক হলে ডাকার অপেক্ষাও করত না। আমার মায়ের অসুখ হয়েছে, তাতে তার কী? সে তার ভোগের কড়ি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়ত।"

"বাজে কথা বোল না।"—একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে উঠলাম, "কোন মানুষই তা পারে না।"

বোধ হয় একটু হাসল, বললে, "মানুষের তুমি কতটুকু জান? তুমি তো অ-মানুষ!"

চুপ করে রইলাম।

একটু থেমে আবার বললে, "রাগ করেছ ?"

সবিস্ময়ে বললাম, "কেন ?"

"তোমাকে অ-মানুষ বলেছি।"

"তাতে রাগ করার কী আছে ?"

"নেই !"

বলে উঠলাম, "থাক্ এসব কথা। কেন তোমার ঘুম ভাঙালাম জিজ্ঞাসা করলে না তো ?"

"জিজ্ঞাসা কী আর করব ! ভয় পেয়েছিলে।"

বললাম, "হ্যাঁ, তা পেয়েছিলাম। কেন, শুনবে ?"

ওকে বললাম ওর মায়ের সব কথা। সেই বার বার 'আমাকে নেবে ! নাও।'

শুনতে শুনতে দুটি চোখ ওর ভরে এল জলে, বললে, "সত্যি বলছ !"

"মিথ্যা বলব কেন ?"

চোখ মুছে বললে, "না, মিথ্যে বলবার লোক তুমি নও।"

বলেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল মায়ের কাছে, বললে, "মা !"

আমিও এসেছিলাম পিছু পিছু। বললাম, "ঘুমোচ্ছেন। ডাকছ কেন ?"

ওর চোখের ধারা আর বাঁধ মানল না, আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগল, "মা পেয়ে গেছে।"

"কী ?"

"মেয়েমানুষের যা পাবার শ্রেষ্ঠ জিনিস।"

ওকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলাম ওর আসনে, বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলাম পাশে। ডেকচেয়ারের হাতলে দু হাত রেখে মাথাটা তলিয়ে দিল তার উপরে, বললে, "তোমায় তো বলেছি, দেববধূ ছিলেন মা। না, দেবদাসী নয়, দেববধূ। দেবতার প্রতি আমাদের দাসীর ভাব নয়, সেবার ভাব নয়, দয়িতার ভাব, প্রেমিকার ভাব।"

বললে, "কত রূপেই না-তিনি আসছেন আমার জীবনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি আমি পাব? পাব না।"

"কেন?"

ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, "আমি যে পাপ করেছি!"

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। ওর কান্না থামাই-ই বা কী করে, অথবা ওকে সান্ত্বনাই বা দিই কী ভাষায়? এই সব দয়িতা-প্রেমিকা, হেন-তেন—এসবের ব্যাখ্যা আমার জানা নেই, বিশ্বাসও তেমন নেই। দেবদাসী আর দেববধূ এদের মধ্যে আসল তফাতটা কোথায়, সেটা ভালভাবে জানলেও না হয় মনোরম ভাষা বিস্তারের একটা প্রয়াস করে দেখতাম।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ কানে গেল দূরাগত সুরের গুঞ্জনধ্বনি, দক্ষিণদেশীয় গায়কের কণ্ঠে হিন্দীগানের উৎসারণ, "জাগো মোহন প্যারে, সঁবরী সুরত মোরে মন ভাবে সুন্দর লাল হমারে—"

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। ভোর হয়ে এসেছে তা হলে? গানের সুরে এই ভোর হওয়ারই বার্তা শোনাচ্ছে নটরাজন। কিন্তু কাকে সে শোনাতে চায়?

আরও কাছে আসতে লাগল গানের সুর। সুর কানে যেতে যেন চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল ভামতী, হঠাৎ চমকে কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বললে, "ওই আসছে। যদি জিজ্ঞাসা করে তো বোল, আমি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছি।"

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে। আর আমি ব্যাপারটাকে ভাল করে অনুধাবন করার আগেই এসে পড়ল নটরাজন।

কাছে এসে বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে, তার পরে আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছেন ইনি?"

"ভালই তো মনে হয়।"

বললে, "সারারাত জেগেছেন তো?"

বললাম, "হ্যাঁ, তা জাগতে হয়েছে।"

একটু অপ্রস্তুতের মতোই বলল, "ভেবেছিলাম উঠে আসব, এসে আপনাকে একটু রেহাই দেব। কিন্তু গানের সুরে সুরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যে, রাত্রে আর আসর ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। এই আসছি। চেট্টিবাবুও সমানে জেগেছে সারা রাত আমার সঙ্গে।"

"চেট্টিবাবু!"

"হ্যাঁ। কী যে হল, একা ঘরে বসে আমি রেওয়াজ করি তো, ও এসে শুয়ে থাকে ওর বিছানায়। আজ দেখলাম অদ্ভুত ওর মনের অবস্থা! বললে—ঘুমব না নটরাজন, সারারাত তোমার গান শুনব। হ্যাঁ, তা গানের পর গান শুনে গেছে। আমিও শ্রোতা পেয়ে—"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "শ্রোতা থাকে না বুঝি?"

একটু হেসে বলল, "প্রথম রাত্রিতে ছুটি-একটি মেয়ে এসে বসে, কিন্তু ওদেরই বা অবকাশ কই? তাই একাই বসে বসে সুর তুলি। চেট্টিবাবু কাল আমার এক পুরনো প্রিয় গান মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। বললে—'সেই গানটা গাও নটরাজন। সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গান।' হ্যাঁ বাবুজী, আমাদের দক্ষিণদেশীয় প্রাচীন কবির একটি গান আছে, তার ভাবার্থ হল—দেবতার মাথার ফুল কৃষ্ণচূড়া, তাকে মাথায় রেখো, কখনও পায়ে ফেলে দলে-পিষে নষ্ট কোর না।"

কী জানি কী হল মনের মধ্যে, একটু হেসে হালকা সুরেই বলে উঠলাম, "শেষকালে ফুলের গান?"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চকিতে তাকাল নটরাজন, তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "হ্যাঁ, ফুলেব গান। ও-বাড়িতে ফুলের নামই যখন সব, তখন ফুলের গানে আর আশ্চর্যের কথা কী?"

স্থান কাল পাত্র অনুসারে কোনও প্রয়োজনই ছিল না ও-প্রসঙ্গ তোলার। তবু, কী আশ্চর্য, আমার মত স্থূলস্বভাবের বাস্তববাদী লোকের মনও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে কী একটা সন্দেহ মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মতোই রেখায়িত হয়ে উঠল। বললাম, "কাল কারও নাম ছিল নাকি কৃষ্ণচূড়া ফুল?"

নিদারুণ চমকে যেন কেঁপে উঠল নটরাজন, তারপরে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "কী বললেন বাবুজী ?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, "না না, কিছু মনে করার না, এমনিই বললাম কথাটা, মানে হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

একটু হেসে জানলার কাছে সরে গিয়ে ঈষৎ চাপা স্বরে নটরাজন বললে, "সত্যি কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আপনার। আপনি হয়তো ওদের সব নিয়মকানুন জানেন না। আসল কথা, কাল ভোরে এসে সবে পৌঁছেছিল সরোজা, অথচ কালই সে মন্দিরের সরোবরে স্নান করে পুজো দিয়ে ওদের যা করণীয়, তা করবার ব্রত গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ নিয়েছিল ফুলের নাম। আর সেই ফুলের নাম হচ্ছে কৃষ্ণচূড়া।

"নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কী করে জানলে ? তোমার তো জানবার কথা নয়। না, সত্যিই আমি জানতাম না, ঘটনাচক্রে জেনে ফেলেছিলাম। আমি তখন চেট্টিবাবুর কাছে বাইরের ঘরে বসে। কে একজন এসে কৃষ্ণচূড়ার নাম বলে ভিতরে চলে গেল। লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাটায় সেই নামটা লাল কালি দিয়ে কাটতে গিয়ে রীতি-মত হাত কাঁপছিল চেট্টিবাবুর। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী হল তোমার, চেট্টিভাইয়া ? আর আশ্চর্য, কেমন যেন ধরা গলায় সে বললে—'কিছু না'। আমি ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়তে গিয়ে দেখি, কৃষ্ণচূড়া হচ্ছে সরোজা।"

বললাম, "তা সরোজার ব্যাপারে চেট্টিবাবুর এমন হল কেন ?"

নটরাজন বললে, "সে এক অদ্ভুত ঘটনা। পরে বলব'খন আপনাকে। কিন্তু ভোর হয়েছে, ওঁর মুখে একটু গঙ্গাজল দিলে ভাল হত।"

"কার মুখে ?"

"সরস্বতী আম্মার।"

বলতে বলতে বৃদ্ধার কাছে এসে দাঁড়াল নটরাজন। তেমনি নিঃঝুমের মতোই একভাবে পড়ে আছেন। ওঁর কপালে আর মাথায়

হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন দেখছিল নটরাজন, বললে, "আমার কী মনে হচ্ছে জানেন ? মহাযাত্রা ওঁর আসন্ন।"

"কী বলছ তুমি !"

একটা নিশ্বাস ফেলে নটরাজন বললে, "হ্যাঁ, তাই আমার মন বলছে। তাই গঙ্গাজল মুখে দিতে চাই। ওঁর মেয়ের মত উনিও দেববধূ ছিলেন, ওঁরও সেই ছোটবয়সে দেবতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।"

"কিন্তু পাবে কোথায় গঙ্গাজল ?"

নটরাজন বললে, "শ্রীকান্তের মন্দিরের পাশে যে ঝিলটি আছে, লোকের বিশ্বাস, তাতে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর অন্তঃসলিলা ধারা এসে মিশেছে। দাঁড়ান, অমি গিয়ে নিয়ে আসছি।"

অন্তরাল থেকে সবই শুনছিল ভামতী। পাশের ঘর থেকে উন্মত্তের মত ছুটে এল সে, নটরাজনকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, "ঠিক বলছ, মা আর বাঁচবে না ?"

ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, বললে, "আপনি এখন ওদের ছেড়ে যেন যাবেন না বাবুজী, আমি আসছি।"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "আমি বলি কী, তুমি বরং ডাক্তারকে খবর দিয়ে এস।"

বললে, "বেশ। পথে ডাক্তারের বাড়ি পড়বে, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

চলে গেল। তবে কি সত্যিই বৃদ্ধার মহাযাত্রা আসন্ন ? ভামতী ওঁকে আকুল হয়ে ডাকত লাগল, "মা—মা !"

চোখ খুলে প্রসন্ন দৃষ্টিতেই তাকালেন মেয়ের দিকে, কী যেন বলবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখে ফুটল না কোনও কথা।

ঘরে আর কেউ নেই। বৃদ্ধা আর ভামতী। কী এক অদৃশ্য টানে ওঁর শিয়রের কাছে বসে পড়লাম এক সময়, ঠাণ্ডা কপালটায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে লাগলাম হাত।

বাক্‌রোধ হয়ে গেলেও জ্ঞান তখনও হারান নি, চোখ ঘুরিয়ে একবার যেন দেখবার চেষ্টা করলেন আমাকে।

বললাম, "কেমন বোধ করছেন ?"

বোধ হয় কানেও গেল আমার কথা, ডান হাতখানা কোনক্রমে তুলে নিয়ে এলেন নিজের গলার কাছে, যেন বলতে চাইলেন, "কী হল আমার! গলার স্বর ফুটছে না কেন ?"

বললাম, "ভাববেন না, এখুনি ডাক্তার এসে পড়বে।"

যেন নিস্তেজের মত পড়ে রইলেন বৃদ্ধা, ভামতী ওঁর পায়ের উপর মুখ রেখে কাঁদছিল, সে এক সময় মুখ তুলে তাকাল মায়ের দিকে, তারপরে আমাকে উদ্দেশ করেই বলে উঠল, "দেখলে তো ? আমার পাপের ফল! নবগ্রহমূর্তিকে লুকিয়ে কিছু করতে ভয় করে, তবু আমি করেছি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তার ফল যাবে কোথায় ? মাকে যে চলেই যেতে হবে।"

মৃদু কণ্ঠে বললাম, "আবার বলছি, তোমাদের এসব সংস্কার আমি মানি না। আর তা ছাড়া, ডাক্তার আসুন, কিছু যে একটা ঘটবেই, এর কী মানে আছে ?"

বললে, "আমি জানি। মা আর থাকবে না।"

মহিলাটি আমার সত্যিই কেউ নন, কিন্তু ভামতীদের এই যে সংস্কারাচ্ছন্ন ভাব, এই যে অন্ধবিশ্বাস, এর বিরুদ্ধে আমার মনটা যেন রুখে দাঁড়াল। ওই যে ভামতী বার বার বলছে আমাকে গোপনে ওর নাম বলে দেওয়া ওর কাছে পাপ—মনে হতে লাগল, তার সঙ্গে আমারও গুরুতর অপরাধ জড়িত আছে। আর এটা যতই মনে হতে লাগল, ততই মনে হল, জয়ী আমাকে হতেই হবে, বাঁচাতেই হবে মহিলাটিকে।

ডাক্তার এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে গেলেন, বোধ হয় 'কোরামিন', হার্টের জন্য। বললাম, "কেমন বুঝছেন ?"

ডাক্তার যা বললেন তাতে বুঝলাম, অবস্থাটা খুবই খারাপ। তবে উপযুক্ত শুশ্রূষা অনেক সময় অসাধ্যও সাধন করতে পারে।

দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় মনকে বাঁধলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, অসাধ্যই সাধন করব। রইল পড়ে আমার কাজ, রইল পড়ে ঘনশ্যামদাসজী, তার ছেলে রামদাস আর পাম্বলু। আমি এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়ব না, যতক্ষণ না মহিলাটি সেরে ওঠেন।

পরদিন এসেও ছিল পাম্বলু আমার খোঁজে, বললে, "রামদাসজী এসেছেন। আপনার খোঁজ করছেন।"

বললাম, "করুন খোঁজ। আমি এখন পারব না যেতে।"

তারও পরের দিন। পাম্বলু এসে বললে, "আজও যাবেন না?"

"না। তাঁর দরকার, তিনি আসুন।"

পাম্বলু বললে, "কে? রামদাসজী? তিনি আসবেন না। কিন্তু শেঠজী যে চলে যাচ্ছেন!"

"তাই নাকি!" বললাম, "তা হোক, তবু যাব না। বরং তাকে আসতে বল।"

পাম্বলু তাড়াতাড়ি দু কানে দুটি আঙুল ছুঁয়ে বলে উঠল, "সর্বনাশ! ছেলে যে সব শুনেছে। বাবাকে কি আর এদিকে আসতে দিতে পারে।"

পরের দিন অবশ্য পাম্বলু আর আসে নি। কিন্তু আমার ব্যাপার দেখে বোধ হয় চমৎকৃতই হয়েছিল নটরাজন আর চেট্টিবাবু। এই চারটে দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে ডুবিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। এ অঞ্চলের সব থেকে বড় ডাক্তারকেই ডেকে এনেছিলাম নিজে গিয়ে চেট্টিবাবুর সাহায্যে। তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ যোগাযোগ রাখা, রোগীর শিয়রে বসে দিন-রাত সেবা করা।

আচ্ছন্নের মত সর্বক্ষণ সরস্বতী আম্মা পড়ে আছেন বটে, কিন্তু জ্ঞান হারান নি একেবারে। তাই আমি কে, আমার সঠিক পরিচয় না জানলেও, আমার সেবার মর্মটা বুঝতেন। এমন হল, নিজের মেয়ের থেকেও আমাকে যেন খুঁজতেন বেশী।

অভিভূত হয়ে চেট্টিবাবু একদিন আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছিল মনে আছে, বলেছিল, "তুমি কে ভাই? এমনটি কখনও দেখি নি।"

আমি একটু হেসে বলেছিলাম, "ভাই বলে ডেকেছ, মনে থাকে যেন !"

"হ্যাঁ। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমার পরমাত্মীয়।"

নটরাজন একান্তে একদিন ডেকে নিয়ে বললে, "আপনার সেবার জন্যই এখনও বেঁচে আছেন। বাস্তবিকই, আপনার ভালবাসাকে আজকের দিনে প্রণাম জানাতে ইচ্ছা করে।"

ওদের সেই চৌকো উঠোনটার এক কোণে বসে ছিলাম দু জন। ওর কথায় একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, "এর মধ্যে ভালবাসাটা আবার দেখলে কোথায় নটরাজন? মানুষ মানুষের জন্য যদি এটুকু না করে তো, চলবে কী করে?"

নটরাজন একটু হাসল, বললে, "আর 'আপনি' করে বলব না—'তুমি'। দেখ, এ কয়দিনে আমাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবে না? সেই অধিকারেই বলছি, দেখবার চোখ আমাদের দিয়েছেন ভগবান, মনও দিয়েছেন অনুভব করবার।"

বললাম, "ভূমিকা রেখে দাও, বলতে চাও কী?"

বললে, "শুনবে বন্ধু? আমিও খেয়ালের বশে একদিন এখানে এসেছিলাম বেড়াতে। আমিও বিদেশী। তামিলনাদের লোক। আমিও তোমার মতো এমনি করে একটি মেয়ের মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম।"

"বটে? কে সে?"

অল্প একটু হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নটরাজন বললে, "সে তো এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে, 'তাকে' উপলক্ষ করে আমারই আত্মবিকাশ। সেটা আগে শোন!"

"বলো।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেমে রইল নটরাজন, যেন ফেলে-আসা সেই দিনগুলির স্মৃতির প্রবাহে অবগাহন করল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে সুপ্তোত্থিতের মতোই বলে উঠল, "জান ভাই, আশ্চর্য এই ওদের রীতি-নীতি। ওই যে ফুলের নাম করার নিয়ম, ওর বোধ হয় উদ্দেশ্যই হচ্ছে,

মনের টানকে বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু মনের ধর্মে আমি শিল্পী, আমি ভাবুকতায় আচ্ছন্ন, আমার মন তাতে কিছুতেই মানলো না।"

"তারপর?"

বললে, "ওই সরোজাকে নিয়ে ঘনশ্যামদাসবাবুর কথা তো শুনেছ। ওঁর ছিল অগাধ পয়সা, তাই বাড়ি-ঘর-দোর সব কিনে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারলেন তিনি। মেয়েটিকেই তিনি নিয়ে যেতে পারলেন। কিন্তু আমরা?"

"বলবে না, কে সেই মেয়েটি? এই নজনের মধ্যে একজনই তো হবে?"

ওকে এই প্রশ্ন করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভামতীর কথা। ভামতীও একদিন ওর সম্বন্ধে এমনি এক সন্দেহের কথাই বলেছিল, "নিশ্চয়ই এখানে কেউ আছে ওর, নইলে এমন করে এখানে ও থাকতে পারত না।"

আমার প্রশ্নে আবার একটু হাসল নটরাজন, বললে, "বার বার একই কথা জানতে চেও না। কী হবে নাম দিয়ে? যদিও আমার সব অনুপ্রেরণাই তাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে, তবু আজ সে আমার কাছে 'একা' একটি মানুষ নয়, এখানকার সবার ওপরই আজ আমার সমান স্নেহ। আমার 'স্নেহ' শব্দটা তুমি লক্ষ্য কোর। আমি চেট্টিবাবুর ওখানে যাই শিক্ষকহিসাবে, অতিথিরূপে কখনও নয়। সে প্রয়োজনও কখনও বোধ করি না।"

একটু অবাক হয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে। আমার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করেই আবার ও একটু হাসল, বললে, "না ভাই, মিথ্যে কথা আমি বলছি না। এ যে কত বড় সত্য, তা হয়তো তুমিও একদিন বুঝতে পারবে।"

বললাম, "তা হলে বলব, তুমি অতি মহৎ ব্যক্তি, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।"

হেসে উঠল হো-হো করে, বললে, "মোটেই জিতেন্দ্রিয় নই। আচ্ছা, একদিন রাত্রে তোমাকে আমার কাছে বসতে দেব, আমি যখন

আমার বীণায় হাত দিয়ে সুরের মধ্যে ডুবে যাব, তখন আমার দিকে তাকিয়ে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, আমি কী বলতে চাই। ওখানে চেট্টিবাবুর যে নিজস্ব ঘরখানা আছে, তুমি দেখ নি সে ঘরখানা। আমি সেখানেই বসে রাত্রে রেওয়াজ করি।"

"মেয়েদের শেখাও কখন ?"

"সকালে।"

"আর রাত ?"

"সম্পূর্ণ নিজের। আমি আর আমার বীণা। না না, আমার নিজস্ব বীণাখানি তুমি দেখ নি, সেটি চেট্টিভাইয়ার ঘরে রেখে দিয়ে এসেছি সযত্নে।"

"এখানে রাখ নি কেন ?"

একটু থেমে তারপরে বললে, "ছিল। কিন্তু আর এখানে বসে বীণায় হাত দিতে পারব না। আমার বীণা বড় স্বার্থপর।"

বলেই একটু হাসল নটরাজন, বললে, "সমস্ত মন-প্রাণটা বীণায় অর্পণ না করলে সে সাড়া দেয় না। এখানে আর সেটা হবার জো নেই, মনঃসংযোগ করতে পারি না।"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নটরাজন, তারপরে একটিও কথা না বলে আপন মনেই চলে গেল অন্যদিকে।

সেদিন সকালের দিকে রোগীর ঘরে আমি একা বসে আছি চুপচাপ। ভামতীকে দেখলাম, একসময় স্নান সেরে পিঠে খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। মায়ের কাছে এসে বসে মাকে পরীক্ষা করে, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আজ একটু ভাল আছে, না ?"

"হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে।"

বললে, "প্রদীপ যেমন নিবে যাবার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে, এ-ও হচ্ছে তাই। আমি জানি, মা আর বাঁচবে না, মা যাবেই।"

ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল, কণ্ঠে জোর এনে বললাম, "কখ্খনো না। হতেই পারে না তা। তুমি ও-ভাবে বলবে না কখনও।"

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে বললে, "তুমিই বা কী অদ্ভুত মানুষ, এখানে এভাবে পড়ে আছ কেন?"

"এমনি। এমন রোগীকে ফেলে আমি যাই কেমন করে?"

বললে, "তাই কী? রোগীকে দেখবার লোকের কি অভাব আছে এখানে?"

"না, তা নয়, তবু—"

কেমন যেন ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল মুখে, বললে, "জানি, কেন তুমি এখানে আছ।"

"কেন?"

আমার চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, অদ্ভুত স্নেহ-ঝরা দুটি চোখের দৃষ্টি। তারপরে কোমল অথচ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, "এত ভালবেসেছ তুমি আমাকে!"

রাগ করে উঠে দাঁড়ালাম, "যত সব কল্পনা! ভালবাসা আবার কোথায়? নিছক একটা কর্তব্যবোধ।"

"তাই বুঝি?"

বললাম, "শোন। আমি একটু বাসা থেকে ঘুরে আসছি। ওদিককার খবরও যে রাখি না অনেক দিন। পান্থলু তিন দিন এসে ঘুরে গেছে।"

"যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

আর কোনদিকে না তাকিয়ে, বিন্দুমাত্র কালক্ষয় না করে, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে রামদাসজীর সঙ্গে। পান্থলু কাছেই ছিল দাঁড়িয়ে। সে-ই আলাপ করিয়ে দিল। ছিম ছাম স্যুট-পরা পরিচ্ছন্ন কর্মঠ চেহারার ব্যক্তি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি যেতে এখনও বাকি, কিন্তু চলনে-বলনে এমন একটা ভারিক্কী ভাব এসে গেছে, যে, যে-কোন গুরুদায়িত্বের ভার বহনে এখুনি তার

দেহ-মন-প্রাণ সর্বতোভাবে প্রস্তুত। নমস্কার জানিয়ে বললেন, "তিন দিন ধরে অপেক্ষায় আছি আপনার সাক্ষাতের। আজ হয়ে গেল।"

হাসিমুখে বললাম, "দু জনের স্বার্থ যে একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, দেখা একদিন হতেই হবে।"

হাস্য-পরিহাসবোধ অবশ্যই আছে ভদ্রলোকের, সহজ বন্ধুত্বের সুরেই বলে উঠলেন, "ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা বলছেন? ও তো আছেই। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আজ নয়। রোগীর সঙ্গে এ কয়দিন যুঝে-যুঝে আপনি ক্লান্ত, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আরাম করে নিন, পরে কথা হবে।"

বললাম, "কিন্তু আমার সব খবরই রেখেছেন দেখছি যে!"

হেসে বললেন, "অপরাধ নেবেন না। এখানে আমি এখন থাকব ঠিক করেছি। সমস্ত পরিস্থিতিটাই তো আমাকে বেশ করে বুঝে নিতে হবে, কী বলেন?"

"তা অবশ্য।"

বলে, আর কথা না বাড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলাম আমি। এটুকু বুঝলাম, রামদাস শুধু শিক্ষিতই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। 'চতুর' বললে কথাটা খারাপ শোনায়, কিন্তু লোকটি আর যাই হোক, ঠকবার পাত্র নয় বা হটবার পাত্রও নয়।

একটু পরেই চুপিচুপি উপরে উঠে এলেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। এ কয়দিনেই স্বাস্থ্য যেন ভেঙে পড়েছে। ঝঞ্ঝাহত, বিপর্যস্ত, অসহায়। বললেন, "আমার ছেলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাবুজী। আজই বিকেলে রওনা করে দিচ্ছে। বলছে, আর দেশ থেকে ফিরতে দেবে না।"

"বললাম, তা হলে আপনার ব্যবসা, আপনার সম্পত্তি?"

বললেন, "সব হয়তো বিক্রি করে দেবে।"

"আপনার মত আছে তাতে?"

বললেন, "আমার পড়ি-লিখি জোয়ান ছেলে, ও যা করবে, তাতে কি অমত করা আমার সাজে?"

সায় দিয়ে বললাম, "তা তো বটেই।"

বললেন, "আচ্ছা, আরাম করুন বাবুজী, আমি পরে আসব।"

'আরাম' করা অবশ্য বেশীক্ষণ হল না, এলো পান্থলু। বিরস তার মুখ। বললে, "খবর খুবই খারাপ বাবুজী। উনি চলে গেলে এখানকার কাজকর্মও বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেপিলের সংসার নিয়ে খাব কী? আবার কি ভাইজাগে যেতে হবে স্টিভেডোর-ফার্মে বিল টাইপ করে দিন কাটাতে?"

কথাটা মনে হতেই হেসে ফেললাম, বললাম, "না পান্থলু, 'নিষিদ্ধ বস্তু'র নাম টাইপ করে পাপ অর্জন করতে হবে না তোমাকে।"

"তবে?"

বললাম, "কিছু ভেবো না। ব্যবসায়ী কখনও ব্যবসা তুলে দিতে পারে না। ঘনশ্যামদাসজী না থাকেন, ওঁর ছেলে থাকবেনই, দেখো।"

"এখানে স্থিতি হয়ে?"

"হ্যাঁ। তুমি দেখে নিও।"

বলেই টেবিলে অপেক্ষমান এ কয়দিনের জমানো ডাকের চিঠিগুলি নিয়ে পড়লাম। পান্থলু বললে, "যাই বাবুজী। রামদাসবাবুর সঙ্গে বেরুচ্ছি"

"কোথায়?"

"যে-সব জায়গায় আপনি প্রস্‌পেক্‌টিং করেছেন, সে-সব জায়গায় উনি ঘুরে ঘুরে দেখবেন বলছেন।"

বললাম, "তা ভালই তো! আমাদের ফার্মের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের যে ব্যবসাটা ঘনশ্যামদাসজী চালাবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন, ওইটাই বুঝি ঠিক করতে চান?"

পান্থলু বললে, "হ্যাঁ, বোধ হয় তাই হবে।"

বললাম, "তবে? বড় যে চাকরি যাবার ভয় করছিলে?"

"আজ্ঞে, বাবুজী, প্রস্‌পেক্‌টিং করে যে-দরের জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে যদি উনি খুশি না হন?"

একটু হেসে বললাম, "হবেনই। ব্যবসায়ী লোক, রত্ন চিনতে ভুল করবে না।"

কথাটার মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থের আভাস লক্ষ্য করে পান্থলু যেতে-যেতেও ঘুরে দাঁড়াল, বললে, "আজ্ঞে ?"

আবার হাসলাম, "বয়সে তরুণ। দেবীপল্লীর রত্নের প্রস্পেক্‌টিং-য়ে নিয়ে যাও না ? তারপরে তোমার চাকরি ঠেকায় কে ?"

উত্তরে বিরসমুখেই পান্থলু বললে, "বড় শক্ত ঠাঁই।"

"কী রকম ?"

চাপা কণ্ঠে পান্থলু বললে, "আসামাত্রই ঠারেঠুরে একটু-আধটু ইঙ্গিত করেছিলাম। সেয়ানা লোক, বুঝেছিল ঠিকই। বললে 'ওখানকার এস্টাব্লিশমেণ্টের কাগজপত্র নিয়ে আসুন। ওসব পাট আমি একেবারেই তুলে দেব'।"

"তারপর ?"

"আপাতত ব্যাপারটা চাপা পড়ে আছে। এখন তো আপনার পাহাড়-পর্বতের প্রসপেক্‌টিয়েই চললাম।"

হেসে বললাম, "এস। শুভাস্তে সন্তু পন্থানঃ !"

চলে গেল পান্থলু। অফিসের জরুরী চিঠিপত্রগুলো পড়ে এবং কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ালম হোটেলের উদ্দেশে। কাছেই হোটেল। ফিরে আসতে বেশী সময় লাগল না। এসে, বিছানার উপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি, রাত্রিজাগরণে চোখ ভারী,—ঘুম আসছে, আবার আসছেও না, কী-এক চিন্তায় এলোমেলো হয়ে আছে মন। মনের এই ভার-হয়ে-হয়ে-থাকা, কিছু ভাল-না-লাগা, অকারণ এক দুশ্চিন্তার পীড়া—এর সঠিক কারণটা যদি নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারতাম তো ভারমুক্ত হওয়া যেত। বার বার ঘুরে ফিরে ভামতীর কথাই মনে জাগছে বটে, কিন্তু নিজের চিন্তা-ধারার জন্যে দুটি বিপরীত স্রোত লক্ষ্য করে নিজেই অবাক হচ্ছি। একবার মনে হচ্ছে, ভামতী ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন ! আবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হচ্ছে—এ কী মোহের জালে জড়াচ্ছি নিজেকে ! এর

থেকে যত তাড়াতাড়ি ছুটি পাই ততই ভাল। ওর সেই একটি কথাই বার বার মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে, "তুমি কবি—তুমি কবি!"

অস্বস্তির আর সীমা নেই। শুয়ে থেকেও মনে হচ্ছে, অজস্র কাঁটা কে যেন ছড়িয়ে রেখে গেছে আমার শয্যায়, যতই পাশ ফিরি, দংশনের জ্বালা থেকে মুক্তি নেই।

কতক্ষণ যে এ-ভাবে কেটে গেছে কে জানে! ঘুমও আসছে, শরীরও শ্রান্ত, অথচ মন চায় না স্থির হতে।

"বাবুজী!"

"কে?"—চমকে, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, চুপচাপ আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। শরীর-মনের সেই বিশ্রামের অবকাশে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে ওঁকে কাছে পেয়ে ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত উল্লসিতই হয়ে উঠলাম আমি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, "আপনি শুয়ে থাকুন, আমি আপনার কাছে এই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসছি।"

"তাতে কী হয়েছে! বসুন আপনি।"

বসে একটু দম নিয়ে তারপরে বললেন, "বাবুজী, খবর তো সবই শুনেছেন।"

বললাম, "আপনার বাচ্চুর খবর?"

সোজা হয়ে বসলেন, কণ্ঠস্বর ধরা-ধরা, বললেন, "ও চলে গেছে, আর আমার সব-কিছু আঁধার হয়ে গেছে! নইলে—।"

থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উনি কোনও কথা বলতে পারলেন না, আমিও না। নীরবে পার হয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

একসময় ওঁর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, কী অব্যক্ত বেদনায় যে ওঁর ভিতরটা গুমরে মরছে, তা যেন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পারলাম কেমন করে? যে গভীর অনুভূতি আর মমতা দিয়ে সংবেদনশীল মানুষ মানুষের মন বুঝতে পারে, আমার তো তা নেই,

ছিলও না। চিরদিন কাজ আর জীবনের বহিরঙ্গ অধ্যায় নিয়ে মেতে আছি, অন্তরের গহীন স্রোতে অবগাহনের মানুষ তো আমি নই। তবে ?

কী আমার হল ? বার বার অন্তর্মুখী কেন হতে চাইছে আজ আমার মন ? এ একধরনের আনন্দও বটে, জ্বালাও বটে।

সব-কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পার হয়ে অবশেষে বলেই উঠলাম, "ঘনশ্যামদাসজী !"

"বলুন।"

বাঁকা একটু হেসে বললাম, "সরোজাকে ছেড়ে দিলেন যে বড় ?"

"আরে, চুপ চুপ," ঘনশ্যামদাসজী চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ছেলে টের পেলে কি আর রক্ষে থাকবে ? আমার 'পড়িলিখি' ছেলে— চাঁদির টুকরো। ওর কাছে কেউ না। দিলাম মেয়েটাকে তাড়িয়ে।"

এত সহজভাবে কথাটা উনি বললেন যে, আমি চমকে উঠলাম মনে মনে। তবে কি সত্য অনুভূতিটুকুর সাড়া জাগে নি আমার মনে ? জানতে কি তা হলে আমি পারি নি ওঁর অন্তরের গভীরতম বেদনার বাণীটুকু ?

বললাম, "মনে কষ্ট হল না ? শুনেছি, খুবই নাকি ভালবাসতেন ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর আমার বাচ্চুই যদি চলে গেল, গণেশজীর বাহনই যদি চলে গেল তো, কী হবে আমার আর সবাইকে নিয়ে ?"

মনে হল, তাই কি সত্যি কথা ? সরোজার থেকে বাচ্চু বড় ? প্রেমের থেকে সংস্কার বড় ? পরক্ষণেই শান্ত হয়ে গেল মন, হতেও পারে। আমারই বা মনে কেন জেগে উঠেছে এই সব প্রশ্ন ? তবু বলে উঠলাম, "সরোজা কোথায় গেল জানেন তো ?"

"তা আর জানি না !" ঘনশ্যামদাসজী বললেন, "সেই 'দেবীপল্লী'-তেই গেছে চেট্টিবাবুর কাছে। ওর যে আমি সবই জানতাম। শুনবেন তবে ? মনে মনে ও ভালবাসে ওই চেট্টিবাবুকে।"

"ভালবাসে !"

"হ্যাঁ বাবুজী। দেখা হলে মুখেই দুজনার ঝগড়া, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত টান। যখন ওকে নিয়ে আসি এখানে, চেট্টিবাবু আসতে দেবে না, তখন সে কী ওর ঝগড়া! যা-তা বলে এসেছিল চেট্টিবাবুকে। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার জানেন? আমার বেশ মনে আছে, চেট্টিবাবু যেন ওর সামনে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। আমি অবশ্য ওসব বুঝি-টুঝি না। ওই বাড়ি, বাগান-টাগান, সব একদিন কিনে নিলাম।"

"এখন নাকি বিক্রি করে দেবেন?"

একটু থেমে তারপর বললেন, "হ্যাঁ, তা দেব। আর যদি বিক্রি করে দিতে না পারি তো, ওদের তাড়িয়ে ওখানে একটা ধর্মশালা বানিয়ে দেব।"

একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম, "তা হলে ওরা যাবে কোথায়?"

"যেখানে খুশি! যেখান থেকে সব এসেছে, সেখানে যাবে।"

"যদি সমাজ ঠাঁই না দেয়, তবে?"

"সে ওদের সমাজ, ওরাই ভাল বুঝবে। আমার ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বাবুজী, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি, ওই সরোজা মেয়েটি কী বেইমান জানেন?"

"কী রকম?"

ঘনশ্যামদাসজী চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপছেন, বললেন, "আমি কত টাকাকড়ি দিতে চাইলাম, নিল না। বললাম, তা হলে একটা বাড়ি কিনে দিই তোমার নামে। তা-ও নিল না। শুনলে আশ্চর্য হবেন, কোন গয়না-গাটি বা শাড়ি-টাড়ি কিছুই নেয় নি। নেহাতই নিজের জিনিসগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

অবাক হয়ে শুনছিলাম সরোজার কাহিনী। তার বিচিত্র চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পেল ওঁর কথার মধ্যে, তাতে মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে উপায় নেই। বললাম, "অদ্ভুত মেয়ে তো!"

"অদ্ভুত!"—ঘনশ্যামদাসজী বললেন, "ও-রকম একরোখা একগুঁয়ে মেয়ে বোধ হয় তামাম দুনিয়া খুঁজে পাবেন না। এ দেমাক কিসের থেকে জানেন?"

"কিসের থেকে ?"

বললেন, "প্রেম। ওই চেট্টিবাবু।"

বললাম, "তা যদি হয় তো, এ-ও এক আশ্চর্য কাহিনী ঘনশ্যামদাসজী!"

"তা হবে।"

আর বিশেষ কিছু না বলে কিছুক্ষণ পরেই বিরসমুখে উঠে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী।

উনি গেলেন বটে, কিন্তু আমার মনে রেখে গেলেন এক অপরূপ বিস্ময়ের ছায়াপাত। সরোজা মেয়েটি আর চেট্টিবাবুকে নিয়ে যে ইঙ্গিত উনি করে গেলেন, তা অনুধাবন করে মনে-মনে পৌঁছনো যায় অপূর্ব এক মাধুর্যের রাজ্যে। চেট্টিবাবুকে ভালবাসে, অথচ তাকে ছেড়ে ঘনশ্যামদাসজীর কণ্ঠলগ্ন হওয়া, এ যেন 'ত্যাগ করে ভোগ করা'র মত অবস্থা! অন্য দিকে ঘনশ্যামদাসজীকে যখন ছেড়ে এল চিরদিনের মত, তখন সর্পিণীর নির্মোক-ত্যাগের মত সব কিছুই মুহূর্তে ত্যাগ করে এল তার, তার গয়না-গাটি অশনবসন, সব। ও-মেয়ের পক্ষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা নয় কি?

আশ্চর্য ঘনশ্যামদাসজীর মানসিক অবস্থাটাও! যাকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে ছেলের কাছে নিজের সম্মান রাখবার জন্য, তাকে তাঁর অদেয় কিছু ছিল না, বাড়ি-ঘর টাকাকড়ি সবই তো দিতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে নিল না, এই প্রত্যাখ্যানের জ্বালাতেই কি শুধু জ্বলছেন তিনি? আর কোনও জ্বালা নয়? প্রেমের স্বরূপ কী, কে জানে, কিন্তু যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল মেয়েটি তাঁর জীবনে, সেই মাধুরীর ক্ষয় হল অকস্মাৎ, সেই ক্ষয়ের কি জ্বালা নেই? আমি যেন নিজের মন দিয়ে ওঁর মনের হাহাকারকে অনুভব করতে পারলাম!

এই সব ভাবতে ভাবতে বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাভিভূত হয়ে থাকব, হঠাৎ একসময় জেগে উঠলাম আচ্ছন্নতা থেকে, দূর ছাই, এসব ব্যাপার এত গভীরভাবে অনুভব করতে শুরু করলাম কবে থেকে?

একটা লোক একটি মেয়েকে তার বিলাসের উপকরণ হিসাবে কাছে রেখেছিল কিছুদিন, তারপরে একদিন মেয়েটিকে সে ছেড়ে দিল, এই তো ঘটনা—এর মধ্য থেকে এত মানসিক দ্বন্দ্ব আর বেদনার সুরই বা অনুধাবন করতে পারছি কেমন করে ?

তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে টেবিলে বসলাম অফিসের কাগজপত্র নিয়ে। ক্রমশ ডুবেই গেলাম কাজে। অর্থাৎ বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল অফিসের কাজকর্মে।

একটা জরুরী চিঠির খসড়া করতে বোধ হয় মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, সিঁড়িতে হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। আমারই খোঁজে ছুটে এসেছে বিশ্বনাথম্, তাড়াতাড়িতে চোখের চশমাটি পর্যন্ত পরতে গেছে ভুলে।

"বাবুজী—বাবুজী !"

"কী ব্যাপার বিশ্বনাথম্ ?"

"শীগগির আসুন আপনি। সরস্বতী আম্মা বোধ হয়—"

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। আমিও যেন নেমে এলাম এক জগৎ থেকে আর-এক জগতে। চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই ঘর, সেই ভামতী আর সেই বৃদ্ধা।

তাড়াতাড়ি জামাটা আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বললাম, "চল।"

একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম, ওঁর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদছে ভামতী, জানলার কাছে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নটরাজন, আর বৃদ্ধা শীর্ণ হাত কোনক্রমে ওঠাতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

"মা গো, কথা কও।"

মেয়ের আর্ত চিৎকারের উত্তরে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কী যেন বলবার, কিন্তু স্বর ফুটছে না কণ্ঠে, শুধু চোখের কোণ বেয়ে নেমে আসছে ধারা।

বললাম, "অমন করে কেঁদো না, তোমার কান্নায় ওঁর কষ্ট হচ্ছে, দেখছ না?"

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ভামতী বলে উঠল, "কী হল মায়ের? কথা বলছে না কেন?"

"ভেবো না। ডাক্তার ডেকে আনছি এখুনি।"

জানলার কাছ থেকে নটরাজন বললে, "ডাক্তার ডাকতে গেছে চেট্টিবাবু।"

"এসেছিল চেট্টিবাবু?"

"হ্যাঁ। এই তো এতক্ষণ কাছে ছিল। আমিও এগিয়ে গিয়ে দেখছি।"

নটরাজন ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি মহিলাটির শুশ্রূষায় মন দিলাম।

ভামতী আবার কেঁদে উঠল, "আমি জানি, মা আর থাকবে না। আমার পাপ—"

"চুপ কর তুমি।" বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলাম, "বলেছি তো, ওঁকে বাঁচিয়ে তুলে আমি প্রমাণ করে দেব যে, সমস্তটাই তোমাদের কুসংস্কার।"

এর পরে বর্ণনায় বাহুল্য কিছু এনে লাভ নেই, আমাদের সমবেত শুশ্রূষায়, আর ডাক্তারের যত্নে ও চিকিৎসায়, সরস্বতী আম্মা দিনকয়েকের মধ্যেই ধাক্কাটা সামলিয়ে উঠলেন। অর্থাৎ ডাক্তারের ভাষায়, "বিপদ কেটে গেল।"

তা অবশ্য গেল, কিন্তু যা রেখে গেল, তাও মর্মান্তিক। বাক্‌যন্ত্রের কী উপসর্গ দেখা দিয়েছিল কে জানে, সরস্বতী আম্মা বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু কথা গেল বন্ধ হয়ে। ডাক্তার বললেন, "কিছু ভাববেন না, এটা সাময়িক।"

দিন যায়। তেমনি করে বিছানায় তলিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে চোখের কোণ ওঠে ভিজে। কাছে গিয়ে বলি, "কী হয়েছে?"

আকারে ইঙ্গিতে বোঝান, "কী হল আমার, কথা বলতে পারছি না কেন?"

চেট্টিবাবু আরও দিন সাতেকের ছুটি দিয়েছেন ভামতীকে, অর্থাৎ মায়ের সেবার জন্য। ইচ্ছা করলে মায়ের কাছে সে থাকতে পারবে আরও সাতটা দিন।

ভামতীকে বললাম, "দেখলে তো? মা সেরে উঠলেন, তোমরা মিছিমিছি একেবারে ভয় পেয়ে—"

মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিল আমার কথা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "শোন।"

"কী?"

নিম্নকণ্ঠে বললে, "পাশের ঘরে যাও।"

আজকাল এই-ই হয়েছে ওর রীতি। আমার সঙ্গে একান্তে কোন কথা বলতে হলে মায়ের সাক্ষাতে বলে না, এইভাবে আড়াল খুঁজে নেয়।

আমি আসবার একটু পরেই ও এল পাশের ঘরে। বললে, "ঠিক বলছ, মাকে নিয়ে আর ভয় নেই?"

একটু হেসে বললাম, "আমি কী বলব, ডাক্তারই তো বলে গেলেন। আর কথা বলতে না-পারা? ওটা অনেক সময় হয়। দিনকয়েকের মধ্যে এটা থেকেও সেরে উঠবেন, তুমি দেখো।"

আমার দুটি হাত ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, "অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। আমরা সবাই জানতাম, মাকে হারাব।"

বললাম, "তা হলে স্বীকার করছ, সংস্কার-টংস্কার সব বাজে! এ তোমার পাপ নয়, কিছু নয়—"

যেন শিউরে উঠল মুহূর্তে, বললে, "ও-কথা বোলো না, পাপ তো নিশ্চয়ই। শুধু তোমারই প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-যাত্রা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম।"

হাসলাম। বললাম, "প্রবল ইচ্ছাশক্তি তা হলে আছে বলে স্বীকার করছ তো?"

"নিশ্চয়ই আছে।" হাসিতে যোগ না দিয়ে তেমনি গাঢ় কণ্ঠে ভামতী বললে, "শুদ্ধ সত্ত্বা যে তোমার!"

পরিহাস-তরল কণ্ঠেই বললাম, "সে আবার কী!"

আমার দুটি হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললে, "মা আরও বলতে পারবে। এসব লক্ষণ মায়ের খুব জানা। দেখছ না, মা কী ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে তোমাকে! আগে 'নটরাজন, নটরাজন' করত, আর আজকাল তোমাকে নইলে তার একদণ্ড চলে না।"

বললাম, "তা অবশ্য। কিন্তু আর নয়, এবার চলি। সন্ধ্যায় আসব।"

অবাক হয়ে বললে, "সন্ধ্যায় আসব মানে! যাবে কোথায়?"

বললাম, "কটা দিন তো এখানে এ-ভাবে কাটল, এবার বাসায় যাই। অফিসের কাজকর্ম কত জমে গেছে জান! দু দিন পাস্থলু এসে ফিরে গেছে।"

হাত দুটো ধরে বললে, "না, সাতটা দিন ছুটি পেয়েছি। এই সাতটা দিন কাছে থাকো।"

বললাম, "কাছেই তো থাকব। সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যায় আসব।"

বললে, "না। যেতে দেব না।"

একটু হেসেই বলে উঠলাম, "পাগল!"

দুটি ছলছল চোখ আমার উপর স্থাপিত করে বললে, "পাগল আমি! এ কয়দিন সমানে রাত জেগে চেহারা কী হয়েছে দেখেছ!"

"তা হোক। বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিলে ঠিক হয়ে যাবে।"

"এখানে ঘুমানো যায় না!"

বললাম, "অফিসের কাজগুলো করবে কে?"

"থাক্ না কাজ এ কয়দিন!"

ওর কপালের উপর চূর্ণালক এসে পড়ে খেলা করছিল ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায়, তার উপর হাতের ছোঁয়া রাখতেই আমার বুকে মুখ লুকাল। বললাম, "কতক্ষণ আর? দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।"

হঠাৎ মুখ তুলল একসময়, গাঢ় কণ্ঠে বললে, "তোমার কাজ-কর্মের খুব ক্ষতি করে দিয়েছি, না ?"

সস্নেহে বললাম, "দূর পাগল ! এসব কথা ভাবতে হবে না। চলি।"

প্রায় জোর করেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম বলা চলে। বাইরের ঘর থেকে কখন নটরাজন বেরিয়ে গেছে চেট্টিবাবুর কাছে। সকালেই তো তার গান শেখানোর পালা। অদ্ভুত গুণী লোক, গানও জানে, নাচও জানে। এবং দুটিই শেখাবার মত ক্ষমতা রাখে। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই কখন যে বাসায় এসে পৌঁছেছি, খেয়াল নেই। পান্থলু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল, "বাবুজী! ইস্ ! আর-একটু আগেও যদি আসতেন !"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন ?"

বললে, "এই একটু আগে ঘনশ্যামদাসজী চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন ! কোথায় ?"

"দেশে। চিরকালের মত।"

"সে কী !"

"হ্যাঁ। আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন।"

"কোথায় ?"

"উপরে, আপনার ঘরের টেবিলে রেখেছি।"

তাড়াতাড়ি উঠে এলাম উপরে। আমার ঘরের একটা চাবি পান্থলুর কাছেই থাকত, কারণ আমার ঘরে বসেই সে আমার কেরানীর কাজটা করে দিত। সুতরাং ঘর ছিল খোলাই।

দেখলাম, "টেবিলের উপর গালা-দিয়ে-শীল-করা একটা খাম পড়ে রয়েছে।"

চিঠিটা তৎক্ষণাৎ না খুলে পান্থলুকে প্রশ্ন করলাম, "চিঠিটা কি টাইপ-করা ?"

পান্থলু বললে, "টাইপ করলে তো আমিই করব। আমাকে তো দেন নি কিছু টাইপ করতে। আর তা ছাড়া, শেঠজী তো ইংরিজী লিখতেই জানতেন না।"

"তা হলে লিখলেন কোন্ ভাষায় ?" বলে উঠলাম, "আচ্ছা সে যাক। রামদাসবাবু কোথায় ?"

পান্থলু বললে, "তিনিও তো বাপের সঙ্গে গেলেন তাঁকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। বাপ রে, তিনটি ট্যাক্সি ভর্তি মালপত্র !"

"ট্যাক্সি পেলেন কোথায় !"

"শহর থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন।"

বললাম, "এত কাণ্ড ! আর আমি কিছু জানতে পারলাম না ?"

পান্থলু বললে, "আমি বলেছিলাম শেঠজীকে। আমি কেন, রামদাসজীও বলেছিলেন। তা বললেন—'না, বাবুজী যেখানে আছে থাক্, তার আরামে ব্যাঘাত কোরো না'।"

মনে মনে হাসলাম কথাটা শুনে, "হ্যাঁ, আরামই বটে।"

মুখে বললাম, "তারপর ?"

পান্থলু বললে, "শুধু যাবার আগে আমাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন—'এই খামটা বাবুজীকে দিস পান্থলু'।"

ততক্ষণে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। বললাম, "চিঠি কী ব্যাপার নিয়ে, তা তুমি জান ?"

"না বাবুজী।"

বললাম, "আচ্ছা, যাও পান্থলু। আমি একটু বিশ্রাম করব।"

পান্থলু বললে, "আজ্ঞে, চিঠিটা ?"

একটু হেসে বললাম, "চিঠির ব্যাপারে তোমারও কৌতূহল হচ্ছে, না ?"

"হ্যাঁ, বাবুজী।"

"পরে খুলব। কী আবার, অফিস-সংক্রান্তই কিছু হবে। হয়তো আয়রন কিংবা ম্যাঙ্গানিজ ওরের যে প্রস্পেক্টিং করছিলাম, সে বিষয় নিয়ে ওঁর আর ব্যবসার ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা নেই। অতএব আমারও প্রস্পেক্টিং শেষ। অর্থাৎ পাত্তাড়ি গুটাতে হবে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পান্থলু বললে, "আমার তা মনে হয় না

বাবুজী। ঘনশ্যামদাসজী ছেলের কাছে এ সম্বন্ধ টুঁ শব্দটিও করেন নি। রামদাসজী ব্যবসা চালু রাখবেন বলে মনে হচ্ছে।"

"তা হলে কী ব্যাপার নিয়ে চিঠিটা লেখা তাঁর!" বলতে-না-বলতেই খামের ধারটা ছিঁড়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। একটা রেজেস্ট্রি-করা দলিল, আর ইংরিজীতেই লেখা একটা চিঠি।

চিঠিটি সংক্ষিপ্ত: 'বাবুজীর সঙ্গে শেষ-দেখা হল না বলে দুঃখিত। অনেক কথা ছিল বাবুজীর সঙ্গে। কাল রাত্রে চুপি-চুপি গিয়েছিলাম 'দেবীপল্লা'তে, চেট্টিবাবুর সঙ্গে সব পাওনা-দেনা চুকিয়ে ফেলতে। ফেলেওছি। কিন্তু যে দলিলটি নিজের হাতে সরোজাকে দেব বলে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা আর দেওয়া হল না। দেখা হল না সরোজার সঙ্গে। প্রথমে মনে হল, চেট্টিবাবুই কায়দা করে দেখা করতে দিচ্ছে না। দেখতে চাইলাম খাতা। তা সে তৎক্ষণাৎই দেখাল। দেখলাম, সত্যিই তার নামটা লাল কালি দিয়ে কাটা। আমি অবশ্য দেখা করতে পারতাম। আমি মালিক, মানি না তাদের আইন-কানুন। কিন্তু চেট্টিবাবুর ঘরটা দেখেছেন তো? নবগ্রহের মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত মনে হল। কেমন যেন হঠাৎ ভয় হল, ওদের নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা-করা নিয়মগুলি ভাঙতে। চলে এলাম।

'বাবুজী, একবার ভেবেছিলাম দলিলটা চেট্টিবাবুর হাতে দিয়ে আসব। কিন্তু তাও পারলাম না। সরোজাকে ও যে মনে মনে ভালবাসে, তা আমি জানি। সরোজার নাম প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে লাল কালি দিয়ে কেটেও যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে, তাকে নাড়া দেব, এ শক্তি আমার কোথায়?

'এ দলিলের কপি আমার সিন্দুকে আছে, যথাসময়ে রামদাসের হাতে পড়বে। তাকে মুখে তো এসব বলতে পারি না, কিন্তু দলিলের মারফতও যে সে এসব ব্যাপার আঁচ করবে এ লজ্জাতেও মরে যেতে ইচ্ছা করছে। ছেলের কাছে—ছি-ছি—এ কী লজ্জা, বলুন তো বাবুজী?

'ভয়ানক রাগ হচ্ছে ওই মেয়েটির ওপরে। ওই সরোজা। তাকে

একটি দিনের তরেও অনাদর করি নি, কিন্তু তবু সে কী ভাবে প্রতি-শোধ নিল একবার দেখুন। আমি তাকে নগদ টাকা দিতে চেয়েছিলাম, তা সে নেয় নি। রামদাস এসে পড়বার আগেই বাড়ি দিতে চেয়েছিলাম রেজেস্ট্রি করে, তাও সে নেয় নি। নিলে ছেলের কাছে এভাবে আমাকে ধরা দিতে হত না।

'কিছুই সে চায় নি। এই না-চাওয়াটাই তার চরম প্রতিশোধ নেওয়া। বাবুজী, একজন যদি আর-একজনের কাছ থেকে কেবল কিছু পেয়েই যায়, তাতে সে সুখী হয় না, পরিবর্তে সে কিছু দিতেও চায়।

'ভেবেছিলাম, দাম্ভিকা মেয়েটিকে কিছুই আমি দেব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে হল। না-দেওয়া পর্যন্ত যে আমার সুখ নেই বাবুজী, স্বস্তি নেই।

'তাই দিলাম। বাড়ি-টাড়ি আমার নামেই রইল, যা পরে ছেলে পাবে, কিন্তু ওই দেবীপল্লীর খরচ-খরচা বাদ দিয়ে, চেট্টিবাবুর অংশ বাদ দিয়ে, আমার নিজস্ব যা আয় হত, তার সব-কিছু স্বত্ব আমি সরোজার নামে সজ্ঞানে লিখে দিলাম। এর সাক্ষী রইলেন আমার এখানকার উকিল, আপনি চিনবেন না, কিন্তু পাম্বলু বা বিশ্বনাথম্, এরা চিনবে। আর সাক্ষা রইল, এ চিঠি যে আমার হয়ে দিচ্ছে, সে। আপনি তাকে চেনেন ভাল করে—বিশ্বনাথম্। সে আমার অতি বিশ্বস্ত লোক, তাকে আমি কিছু টাকা দিয়ে গেলাম।...'

আমার সঙ্গে সঙ্গে পাম্বলুও পড়ছিল চিঠিটা। সে এই সময় অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "বিশ্বনাথম্!"

বললাম, "প্রাইভেটে বি-কম পড়ছে যে ছেলেটা, ওই যে চেট্টিবাবুর ডান হাত, ওদের এজেন্ট, সেই বিশ্বনাথম্। পুরু কাচের চশমা-পরা।"

পাম্বলু বলে উঠল, "বাহাদুর ছেলে বটে!"

আমি ততক্ষণে ডুবে গেছি চিঠিটার শেষ অংশে।

'বাবুজী, যতই রাগ করি, মেয়েটিকে ভোলা আমার পক্ষে কষ্ট হবে। আপনি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন।

বিশ্বনাথম্ এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে হয়তো। সে যাতে আমার এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করে, সেটা দেখবেন।...

একটু চমকেই মুখ তুললাম। বিশ্বনাথম্? সে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, এ-কথাটার অর্থ কী? তবে কি ফুলের নাম ছাড়াও গোপনে সাক্ষাৎ করার কোন উপায় জানা আছে বিশ্বনাথমের? দেখতে হবে, জানতে হবে ব্যাপারটা। আবার পড়তে লাগলাম চিঠিটা।

'বাবুজী, ব্যবসায়ী লোক আমি, টাকা-আনা-পাই নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু ওই মেয়েটার সঙ্গে মিশে এইটুকু মনে হয়েছে, মানুষের মন কখনও মরে না। সে ভেঙে পড়ে, কখনও বিকৃত পথও ধরে, কিন্তু আলোর ছোঁয়া পেলে আবার সে জেগে ওঠে। এই আলোর ছোঁয়া হচ্ছে, প্রেমের পরশ। এই 'প্রেম' যে কী, তা আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু এটুকু বলব, এত করেও আমি তা পাই নি, এক বিন্দুও পাই নি। অবশ্য বলবেন, পাবার দরকারই বা কী? দরকার থাকে না, টাকার নেশায়, কাজের নেশায়, অন্য নানান নেশায়, মানুষ তার এই সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা ভুলেই থাকে; কিন্তু যখন মনে পড়ে তখন?

'সে হাহাকারের তুলনা নেই, সে বেদনার কোন উপমাও নেই। আপনি শক্ত মানুষ, আপনার হয়তো আমার মত অবস্থা কখনও হবে না। তবু বলি, সাবধান। মনের সঙ্গে জড়াবেন না কারুর মন। একজনকে যদি ভাল লেগে যায় তো তক্ষুনি আর একজনের দিকে ঝুঁকবেন, ভুলেও আর তার সঙ্গ নয়।'

চিঠি শেষ করবার পর, আমি আর পাম্বলু কেউই কথা বলতে পারি নি কিছুক্ষণ। নীরবে একসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। আমিও চাকরটাকে ডেকে মুহুর্মুহু কয়েক কাপ চা আনিয়ে খেলাম।

অফিসের জরুরী একটি চিঠির উত্তর লিখলাম। ল্যাবরেটরি অ্যানালিসিস্ অর্থাৎ যাকে বলে 'অ্যাসে-রিপোর্ট' তাই এসেছে অফিস থেকে। আমার পাঠানো ম্যাঙ্গানিজ ওরের নমুনার মূল্যায়ন।

খুবই সন্তোষজনক এবং চিঠিটা রামদাসবাবুকে দেখানোও দরকার। ব্যবসা যদি এদিক দিয়ে তিনি করতে চান তো, এই সুযোগ।

কিন্তু বাপকে পৌঁছে তিনি ফিরে আসবার আগেই আমার হোটেল-পর্ব সমাধা হয়ে গিয়ে দিবানিদ্রার পালা চলেছে। ঘুম ভেঙে যখন উঠলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পোশাকাদি পরিবর্তন করে, খামসুদ্ধ ঘনশ্যামদাসজীর চিঠিটা পকেটে নিয়ে, নীচে নেমেছি, দেখি একটি ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ শুয়ে আছেন রামদাস। একা।

বলে উঠলেন, "চললেন বাবুজী?"

ভাবলাম, ঘনশ্যামদাসজীর দলিলের কথাটা ওঁকে তখন বলেই ফেলব নাকি? পরক্ষণেই মনে হল সিন্দুক খুললেই তো যথাসময়ে দলিলটার কপি ওঁর চোখে পড়বে। আমি আগে থাকতেই বা বলতে যাই কেন? মনের ভাব গোপন করে সহজ কণ্ঠে বলে উঠলাম, "একটু পরেই ফিরে আসছি। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"আমারও আছে।"

"কী রকম!"

রামদাস বললেন, "আসুন ফিরে। পরেই হবে।"

চলতে চলতে মনে হল, দলিলের কথা কি তা হলে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে রামদাস? কে জানে!

এ অবস্থায়, আমার কর্তব্য কী? আমার কর্তব্য চুপচাপ দলিলটা সরোজার হাতে পৌঁছে দেওয়া। বিশ্বনাথমের সঙ্গে গোপনে দেখা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কে আগে? বিশ্বনাথম্, না ভামতী?

ভাবলাম, আগে ভামতীর সঙ্গেই হোক আমার সাক্ষাৎকার, পরে বিশ্বনাথমের সঙ্গে দেখা করলেই হবে।

গেলাম। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাঢ় হলদে রঙের একটা শাড়ি পরেছে, খোঁপায় হলদে রঙের একরাশ কলকে ফুল। বললে, "জান? মা কথা বলেছে।"

"বলেছেন!"

"হ্যাঁ, এস শীগ্‌গির।"

বলে আমার হাত ধরে একপ্রকার আমাকে টেনেই নিয়ে চলল ভিতরে। প্রথমেই পড়ে নটরাজনের ঘর। বইপত্র কী সব গোছাচ্ছিল যেন, বললে, "এই যে বাবুজী! এসেছ?"

ভামতী তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছেড়ে দিল। বোধ হয় লজ্জা পেয়েই।

হাসিমুখে বললাম, "না এসে পারলাম কই?"

স্নিগ্ধ, সস্নেহ হাসি নটরাজনের মুখে, বলল, "ও-বাড়ি যাচ্ছি বাবুজী। তুমি আসবে? বীণা শোনাব।"

আমি উত্তর দেবার আগেই ছেলেমানুষির স্বরেই বলে উঠল ভামতী, "না, বাবুজী যাবে না। তুমি একাই থাকো গিয়ে তোমার বীণা নিয়ে।"

হেসে উঠল নটরাজন, বললে, "তা হলে দেখছি ছুটি পেলে না বাবুজী। আচ্ছা, আমি চলি।"

আমাদের দুটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, বললে, "শোন। কাল ও-বাড়ির একটি মেয়ে, তার নাম ভারাহালু, ওদের যে নিজস্ব মন্দির আছে বাড়ির ভিতরের বাগানটাতে, পুরুষোত্তমের মন্দির, সেখানে নাচ দেখাবে। কাল খুব ভোরে, ব্রাহ্মমুহূর্তে। তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এসো।"

"মন্দিরে নাচ দেখাচ্ছে মানে?"

নটরাজন বললে, "আমাদের ভাষায় বলি, 'আরঙ্গেত্রম্'। এর তেলেগু প্রতিশব্দ আমার ঠিক জানা নেই। ভামতী জানে। ওর কাছ থেকে জেনে নিও।"

চলে গেল নটরাজন। পথ থেকে ওর কণ্ঠের মিলিয়ে-যাওয়া গানের সুর শোনা গেল, "ভামনে সত্যভামনে—"

একটু অবাক হয়েই বলে উঠলাম, "নটরাজন আজ হিন্দী গান ছেড়ে তোমাদের ভাষায় গান গাইছে, ব্যাপারটা কা?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল ভামতী, "ও-পাগলটার কথা ছেড়ে দাও।"

বললাম, "কিন্তু কথাটার মানে কী হল? 'ভামনে সত্যভামনে...' মানে?"

আমার হাতে হাতটা জড়িয়ে হেসে ফেলল ভামতী, "বাপ রে, কোনও জিনিসটাই এড়িয়ে যাবার জো নেই। সহস্রচক্ষু!"

বললাম, "অযথা কৌতূহল লক্ষ্য করে মনে মনে রাগ করলে বুঝি?"

স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি আমার দু চোখে ন্যস্ত করে, গভীর কণ্ঠে বলল, "না গো, রাগ করি নি। আমাদের কথা এমন করে জানতে চাও, এতে রাগ করব? জানতে তো তুমি চাইবেই। তুমি যে কবি!"

মুহূর্তে বিরক্ত হয়ে ছাড়িয়ে নিলাম ওর হাত, বললাম, "কী বলছ এসব!"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর আমার একটি হাত ওর দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, "বেশ, আর বলব না। খুশী তো?"

আমি তখনও মুখ ভার করে আছি লক্ষ্য করে বলে উঠল, "হয়েছে হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না। এখন শোন, ও কী বলে গেল।"

"কে?"

"নটরাজন। ওই যে গান গাইল না? 'ভামনে সত্যভামনে!' আমি নারী। কিন্তু কোন্ নারী? সত্যভামা।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তা হঠাৎ 'আমি সত্যভামা' এই কথা গাইতে গেল কেন?"

"খেয়াল। ওর কি কোন মানে ধরতে আছে? ও-গানটা হচ্ছে একটা দারু।"

"দারু মানে?"

"মানে, পাত্রপ্রবেশ দারু।"

"পাত্রপ্রবেশ দারু! মানে?"

বললে, "বাব্বা! কত 'মানে'র মানে আর বলব? চল না ওই ঘরে মার কাছে। মা সব জানে, বলবে 'খন।"

বললাম, "হ্যাঁ। রোগা মানুষকে বকবক করাই আর কি!" তুমি বল না? তুমিও তো কম জান না দেখছি।"

বললে, "ভরতনাট্যম্ জান?"

"জানি না? তোমাদের সারা দাক্ষিণাত্যই তো 'ভরতনাট্যম'-নৃত্যের জন্য বিখ্যাত।"

"দেখেছ ভরতনাট্যম্?"

"তা কিছু কিছু দেখেছি বইকি।"

বললে, "ছাই দেখেছ। যা সব তোমরা দেখে থাক, ভরত-নাট্যমের সে আর কতটুকু?"

"মানে!"

হেসে বললে, "আবার মানে? তোমার মানের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব?"

"বল না?"

বললে, "যে ভরতনাট্যমের চর্চা বেশী হয়, যার পরিচয় বাইরের লোকেও জেনেছে, তা ভরতনাট্যমের একটা অংশ মাত্র। আমরা তাকে বলি, সাডির নৃত্য। অবশ্য এর মুল্যও কম নয়। যুগ যুগ ধরে দেবদাসীরা এই নাচ শিখে আসছে। এর মূল রসটা হচ্ছে, যাকে বলে শৃঙ্গার রস।"

"তুমি জান এই নাচ?"

"সামান্য। এরই আর-এক নাম দাসী আট্টম্। দেবদাসীরা নাচত কিনা, তাই।"

"তোমাদেরও এই নাচ শিখতে হয় তো?"

"ওই যে নটরাজন। ও শেখাচ্ছে কিছু কিছু। ওই তো শুনলে? একটি মেয়ে, ভারাহালু, কাল ভোরে মন্দিরে তার জীবনের প্রথম নাচ দেখাবে। দেখো। যদিও সেটা ঠিক সাডির নৃত্য, অর্থাৎ দাসী আট্টম্ নয়।"

"তা হলে ?"

বললে, "যেটা তোমরা দেখ সাধারণত, অর্থাৎ এই যে সাডির নৃত্য, এটা শিবের মন্দিরে হয়ে থাকে। কিন্তু শুনলে তো ? আমাদের যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর সামনে যে নৃত্য হয়, তা একটু আলাদা। একে আমাদের অন্ধ্রদেশে বলে, কুচিপুডি। এ নাচ সচরাচর লোকে দেখতে পায় না। একে ঠিক নাচও বলা চলে না, এ হচ্ছে নৃত্যনাট্য। নাচও থাকে, অভিনয়ও থাকে।"

"বটে, দেখতে পারি না কোথাও এ নাচ ?"

হেসে বললে, "কোথায় দেখবে! মরে যাচ্ছে। ওই তামিল-নাদের লোকটা, ওই নটরাজন, ওই লোকটা পাগল, ও আমাদের মধ্যে ওই নাচ আবার প্রচলন করতে চায়।"

"ও জানে ?"

"হ্যাঁ। পিতৃদত্ত কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে, তারই আয়ে যা-খুশি তাই করে বেড়ায়। কেউ তো কোথাও নেই। কুচিপুডি বলে একটা গ্রাম আছে, সেখান থেকে ও কিছু কিছু শিখে এসেছে। মাঝে মাঝে এখনও ও যায় সেই গ্রামে ওর গুরুর কাছে।"

বললাম, "কুচিপুডি একটা গ্রামের নাম তা হলে ?"

"হ্যাঁ। ওই গ্রামের নাম থেকেই নাচটার নাম হয়েছে কুচিপুডি। কৃষ্ণের পারিজাত হরণের গল্প জান তো ? বিয়ের পর সত্যভামা কৃষ্ণকে বলেন, স্বর্গ থেকে পারিজাত গাছটিসুদ্ধ নিয়ে আসতে, তিনি তাঁর বাগানে পুঁতবেন। স্ত্রীর কথা রাখতেই তো ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ। জান না এই গল্প ?"

বললাম, "ঠিক জানি না। কিন্তু বল। তার পর ?"

বললে, "এই গল্প নিয়েই একটি কুচিপুডি নৃত্যনাট্য আছে, তার নাম ভাম-কলাপম্। তার নিয়মটা হচ্ছে কী জান ? প্রধান চরিত্র-গুলির মধ্যে যখন যে চরিত্র মঞ্চে এসে প্রবেশ করবে, সে তার মুখে অভিনয় আরম্ভ করবার আগে, ছোট্ট গান গেয়ে আর নাচের মুদ্রা দেখিয়ে তার নিজের পরিচয়টা আগে দিয়ে দেয়। তাকেই বলে

পাত্রপ্রবেশদারু। ভাম-কলাপম্‌-এ 'সত্যভামা' যখন প্রথম মঞ্চপ্রবেশ করে, তখন সে ওই গানটা গায়, যেটা তুমি নটরাজনের মুখে এইমাত্র শুনলে, 'ভামনে সত্যভামনে'—আমি নারী সত্যভামা।"

মন দিয়েই শুনছিলাম ওর কথা, বলে উঠলাম, "বাঃ! সুন্দর তো! তুমি জান সত্যভামার নাচ?"

"সর্বনাশ! কোত্থেকে জানব? ও নাচ মেয়েদের নাচবার নিয়ম নেই। ছেলেরাই নাচে।"

"মেয়ের ভূমিকা?"

"হ্যাঁ, মেয়ের ভূমিকা।"

বললাম, "তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ এই নাচ?"

"না। আমার মা দেখেছে। মা জানে।"

একটুক্ষণ চুপচাপ। বললাম, "ওই যে মেয়েটি কাল নাচবে, ভারাহালু, সে কী নাচবে? কুচিপুড়ি?"

"হ্যাঁ। সে যে নাচটা নাচবে, তাকে আমরা বলি, পূজা-নৃত্য। অনেকটা সাডির নৃত্যের আলারিপ্পুর মত। অথচ ঠিক আলারিপ্পু নয়।"

বললাম, "তা হলে কাল ভোরে আসতেই হবে। দেখতেই হবে নাচ। আচ্ছা, এ নাচ মন্দিরে কেন?"

বললে, "এইই নিয়ম। শোন, নাচ শেখবার পর সেই নাচটা প্রথম দেখাতে হয় দেবতাকে। আমাদের পুরুষোত্তমই তো পরম দেবতা। তাঁরই তো বধূ আমরা। কিন্তু আর বকবক করব কতক্ষণ? মায়ের কাছে যাবে না?"

"চল।"

আমার হাত ধরে আবার তেমনি করে নিয়ে চলল ভিতরে।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম, তেমন করেই শুয়ে আছেন বিছানায়। মুখের ভাবে প্রসন্নতা। আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলেন। স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল মুখ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, তবু বললেন, "কাছে বোস। তোমাকে দেখি।"

বসলাম। হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন আমার কাঁধের উপর, নিজের

দিকে একটু আকর্ষণ করে, মনোযোগসহকারে কী যেন দেখতে লাগলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, অস্বস্তি বোধ করে চোখ নামাতেই বলে উঠলেন, "ভামতী ভুল করে নি।"

আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ভামতী, তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়া আমার পিঠের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "দেখলে তো মা! তোমার শিক্ষা আমি কিছু কিছু পেয়েছি। কিন্তু তুমি আর কথা বোলো না মা, বড় দুর্বল তুমি, কথা বললে হাঁপিয়ে উঠবে।"

সত্যি কথা। ওইটুকু কথা বলেই শ্রান্ত বোধ করছিলেন মহিলাটি। বললাম, "একেবারে সেরে উঠুন, আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনব।"

খুশী হয়ে মাথা নাড়লেন উনি। ভামতী পিঠের ওপর আঙুলের সামান্য একটু চাপ দিয়ে বললে, "ওঠ। রান্নাঘরে রান্না করছি দেখবে এস।"

তারপরে মায়ের দিকে ফিরে বললে, "ওকে নিয়ে যাই মা?"

আমার ডান হাতটি ধরে কী যেন লক্ষ্য করছিলেন মহিলাটি, মাথা নেড়ে উনি সম্মতি জানাতেই আমি উঠে পড়লাম, কিন্তু হাতটা রইল ওঁর হাতে। হাতটা ধরা অবস্থাতেই আমার আংটিটায় আঙুল বুলাতে বুলাতেই হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ আংটি কোথায় পেলে তুমি?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ভামতী, "আমি দিয়েছি।"

কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, প্রথমে মুখখানা সাদা হয়ে গেল, তারপরে ধীরে ধীরে খুশির আলো জাগল মুখে, বললেন, "ও আংটি আমার। আমিই পরতাম। ভামতীকে দিয়েছিলাম। খুব ভাল হয়েছে। ওটা তুমি সব সময় পরবে।"

ভামতী মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকে বললে, "খুশী হয়েছ মা?"

আবার শ্রান্তিবোধ করছিলেন উনি, মাথা নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ।"

ভামতী বললে, "শুয়ে থাকো। আমি ওকে ভিতরে নিয়ে চললাম।"

মহিলাটি যেন কী এক চিন্তার গভীরে মুহূর্তে তলিয়ে গেছেন ততক্ষণে, সাড়া দিলেন না।

একটা পিঁড়ি পেতে দিয়ে ভামতী বললে, "বস।"

বসতে বসতে বললাম, "ঠিক এইখানটিতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও তফাত নেই। রান্নাঘরের ব্যাপারে দেখছি, একেবারে আমাদের দেশের মত।"

"তা বলে মাছ রান্না করি না আমরা।"

এই বাহ্য পরিবেশের দিক থেকে কে বলবে তখন যে, আমি আমার দেশের রান্নাঘরে বসে আছি না?

ভামতী বললে, "বাক্‌চাতুরী রাখ। খাওয়াদাওয়া করে রাত্রে আর যাওয়া হবে না।"

বললাম, "উপায় নেই। অফিসের কাজের ব্যাপারে রামদাসজী বসে থাকবেন। আর তা ছাড়া, আমার অন্য কাজও আছে।" একবার ভাবলাম, সরোজার কথাটা একে বলেই ফেলি। কিন্তু কী ভেবে আর পারলাম না।

ও বললে, "থাকে থাকুক, আবার বলছি, আজ ছাড়ব না কিছুতেই।"

বললাম, "মা রয়েছেন। এভাবে আমার এখানে রাত্রে থাকাটা দৃষ্টিকটু ঠেকবে।"

ঝংকার দিয়ে বলে উঠল ভামতী, "রাখ তো ওসব বাজে ওজর-আপত্তি। এই নাও, কেমন 'মসলা-পাঁপর' ভেজেছি, একটু খেয়ে দেখ।"

খেতে খেতে বললাম, "তা হলে ছুটি পাচ্ছি না সত্যিই?"

"না।" ভামতী বললে, "কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলে? তোমাকে আংটিটা দেওয়াতে মা একটুও রাগ করল না! ওটা যে মার বড় আদরের।"

"আমাকে দিলে কেন তবে?"

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, "বেশ করেছি। আসলে ওটা মায়েরও নয়।"

"কার?"

মুখ টিপে হেসে বললে, "শুনেছিলাম, অপরের হাতের আংটি। মাকে দিয়েছিলেন তিনি।"

"কিন্তু 'তিনি'টি কে?"

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল, "অতশত আমি জানি না।"

অল্প একটু হেসে বললাম, "জান না যখন, তখন উঠি।"

"মানে!"

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "চলে যাচ্ছ?"

ওর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হেসে উঠলাম, বললাম, "যাব না। বসে বসে রান্না কর। আসছি ঘুরে। চেট্টিবাবুর খবর নেওয়া হয় না, যাই একটু গল্প করে আসি।"

ভামতীর ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি, বললে, "আসলে আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছা হয়েছে, তাই না?"

অপ্রতিভের মত হেসে উঠলাম, বললাম, "কী যে বল!"

"কেন?"

বললাম, "অনন্য মেয়েকে যে পেয়েছে, অন্য মেয়ের সঙ্গে সে ভাব করতে যাবে কেন?"

দুটি চোখে খুশির বিদ্যুতি, কিন্তু মুখে কৃত্রিম কোপ। বললে, "ইস! অত বাক্‌চাতুরী করতে হবে না। আমি 'অনন্য মেয়ে' হতে যাব কেন?"

একটি হাত চট করে ধরে ফেললাম, বললাম, "সত্যি কথা। অভিভূত হবার মত চরিত্রেরই মেয়ে তুমি।"

বলেই আর দাঁড়ালাম না, কথাটা বলেই কেমন যেন লজ্জা হল, এ ধরনের কথা যে আমার মুখেই একদিন আসতে পারে, এ আমি নিজেই জানতাম না।

চলে আসছি, পিছন থেকে বলে উঠল, "শীগগির এস কিন্তু। বসে থাকব।"

ওর মায়ের ঘরের মধ্য দিয়েই বাইরে যেতে হয়। ঠিক তেমনি শুয়ে আছেন। তাড়াতাড়িতে চোখে পড়বার কথা নয়, তবু চোখে পড়ল। দুটি চোখ নিমীলিত, কিন্তু চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছে অবিরল ধারায়।

কাছে গিয়ে বললাম, "এ কী, কাঁদছেন কেন এমন করে?"

চমকে চোখ খুললেন। দুর্বল হাতটা উঠিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "না না, ও কিছু নয়।"

"কাঁদবেন না। দুঃখ কিসের আপনার? আপনি তো সেরে উঠেছেন।"

দুটি পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, "ও-আংটি যেন কখনও খুলো না।"

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠেই বলে উঠলাম, "আপনার মেয়ের কিন্তু এটা আমাকে দেওয়া ঠিক হয় নি।"

"ঠিকই হয়েছে।" উনি একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ঠিক তোমারই মত একজন। এমনি খেয়ালী। এমনি বৈরাগ্যের দৃষ্টি।"

একটু হেসে বললাম, "আমার বৈরাগ্য আছে এ-কথা শুনলে লোকে হাসবে। আমি সাধারণ লোক, রিপুর বশ।"

বললেন, "রিপু থেকে অ-রিপুতে যাওয়ার পথ যে তোমার জানা। তুমি যাবেই। আমি সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে-চোখে-কপালে।"

বললাম, "বোধ হয় ভুল হয়েছে আপনাদের।"

"না। আমাদের চোখ পুরুষদের সম্পর্কে কতকগুলি ব্যাপার সহজেই বুঝতে পারে। জান, সেও তোমার মত ছিল, তাকে বাঁধতে পারি নি, অমন মানুষকে বাঁধা যায়ও না। হয়তো সংসার করে, গৃহীও হয়। কিন্তু তবু তারা থাকে আজন্ম বৈরাগী।"

কোন বিস্মৃত সুসুপ্ত তারে যেন আঘাত লেগেছে, বীণার মত বাজছে সেই তার, আবার ওঁর চোখ হয়ে উঠল সজল। তাড়াতাড়ি বললাম, "আর কথা বলবেন না, কাঁদলেও চলবে না। আমি যাই, একটু ঘুরে আবার আসছি। কেমন?"

উনি চোখ মুছলেন, তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, "আচ্ছা।"

সেই নবগ্রহের অদ্ভুত মূর্তি, সেই ধূপ, সেই মূর্তির পায়ের কাছে পুজো-করা ফুল। হাতবাক্সের উপরে লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাটা খুলে মাথাটা তার উপরে হুইয়ে রেখে বসে ছিল চেট্টিবাবু। আর পুরু কাচের চশমা-পরা বিশ্বনাথম্ বি-এ কমার্সের বই এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে রেখে, উবু হয়ে বসে খাতায় বুঝি কোন প্রবন্ধই লিখে চলেছে একমনে।

ভেজানো দরজা খোলার শব্দেই চমক ভাঙল ওদের। চেট্টিবাবু আমাকে দেখে বলে উঠল, "বাবুজী।"

"হ্যাঁ।"

বিশ্বনাথম্ অবাক হয়ে বললে, "এখানে?"

আপন মনেই একটু হেসে বলে উঠলাম, "ফুলের নাম করব।"

সোজা হয়ে বসল বিশ্বনাথম্, কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, "তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করব বিশ্বনাথম্? একবার আমার বাসায় যেতে হবে। রামদাসজী বসে থাকবেন আমার জন্য। পাম্বলুও থাকবে। ওদের বলে এস, আমি এখানে আটকে গেলাম, বাড়ি ফেরা আজ আর হল না।"

"বেশ।"—বলে উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাথম্, তারপরে তার স্যাণ্ডেল-জোড়ায় পা গলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে গেল ঘর থেকে।

পিছন থেকে ডেকে উঠলাম আমি, "শোন বিশ্বনাথম্।"

দরজার কাছে ও দাঁড়িয়ে গেল। আমি উঠে পড়ে বললাম,

"আরও একটা কথা জানাবার আছে রামদাসজীকে। শোন এদিকে।" বলে আর কোন দিকে না তাকিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে গেলাম ঘরের বাইরে। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ওকে টেনে নিলাম পথের এক নির্জন প্রান্তে, বললাম, "রামদাসজীকে যা বলতে বললাম, তা তুমি বলে এস। কিন্তু তাকে আর-কিছু সত্যিসত্যি জানাবার নেই। একটা গোপন কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল বিশ্বনাথম্ আমার আচরণে, বললে, "কী কথা! বলুন?" ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে ফেললাম, "সরোজার সঙ্গে গোপনে আমাকে একটু দেখা করিয়ে দিতে পার?"

"কেন?"

বললাম, "ঘনশ্যামদাসজী সরোজাকে দেবার জন্য আমার হাতে একটা দলিল দিয়েছেন। এবং আমি জানি, এ দলিলের সব খবর তোমার জানা, তুমিই লিখেছ ওই দলিল।"

বিশ্বনাথম্ একটু থেমে থেকে সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল, তারপরে বললে, "সবই তো জেনেছেন দেখছি। কিন্তু, চেট্টিবাবুকে কি এসব কোন কথা বলেছেন?"

"না—না।" বললাম, "সে যাতে জানতে না পায়, সেজন্যই তো তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলাম!"

বিশ্বনাথম্ বললে, "অবশ্য আপনার নিজের হাতেই দলিলটা ওকে দেওয়া উচিত। আমার হাত দিয়ে গেলে আমার সম্বন্ধে নানান সন্দেহ জাগতে পারে ওদের মনে। আচ্ছা, এক কাজ করুন। কাল সকালে, অর্থাৎ মন্দিরের আরতির সময় আপনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে আসুন। ওখানে দেখা করিয়ে দেব। আমি যে এ ব্যাপারের মধ্যে আছি, ঘুণাক্ষরেও এটা কাউকে যেন জানতে দেবেন না।"

"না, তা দেব না," বললাম, "কিন্তু, একটা কথা। মন্দিরে যে দেখা করিয়ে দেবে, সেটা তোমাদের নিয়মবিরুদ্ধ নয় তো?"

"নিয়মবিরুদ্ধ তো বটেই।" বিশ্বনাথম্ বললে, "কিন্তু নিয়মটা

করেছে কে? ট্রেডের খাতিরে আমি ওসব মেনে নিয়েছি, নইলে অন্তরের সঙ্গে আমার ওসবে সায় নেই। ওসবে বিশ্বাসও করি না। আচ্ছা, আমি চলি। এতক্ষণ এভাবে গল্প করা ঠিক নয়। চেট্টিবাবু কিছু সন্দেহ করতে পারে। আপনি ওর কাছে যান।"

বিশ্বনাথম্ চলে গেল। আমি আবার প্রবেশ করলাম ভেজানো দরজাটা ঠেলে। ঘরে তখন আর-কেউ নেই। ধীরে ধীরে বসলাম গিয়ে ওর কাছে, খাটের উপরে। মনে হল কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে চেট্টিবাবুকে।

কণ্ঠে একটু পরিহাসতরলতার সুর এনেই বলে উঠলাম, "কই, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না?"

চমক ভেঙে চেট্টিবাবু বললে, "কোথায় আটকালে? এ-বাড়িতে, না, ও-বাড়িতে? আমি ভামতীর কথা বলছি।"

অত সোজাসুজি প্রশ্নে একটু লজ্জিতই হলাম বলা যায়, তাড়াতাড়ি সে লজ্জা কাটাবার জন্যই বলে উঠলাম, "তুমি কি মনে কর, অত সহজেই আটকে যাবার লোক আমি?"

"কে জানে!"

"ফুলের নাম করি? আজ অন্য কারুর সঙ্গে গল্প করে কাটাব।"

একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে, বললে, "কী হয়েছে বল তো? ঝগড়া করেছ?"

"দূর, ঝগড়া হতে যাবে কেন! এই তো গল্প করে এলাম তার সঙ্গে। সরস্বতী আম্মাও ভাল আছেন।"

"জানি। কিন্তু—"

বললাম, "কিন্তু-টিন্তু নয়, নাম করব ফুলের?"

সেদিন কেন যে অত ফুলের নাম করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ আজ কিছুটা বুঝি। সরস্বতী আম্মার কথাবার্তাই এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মূলে। ওই যে তিনি বললেন, আমি বৈরাগী, আমার কোন-কিছুতে আসক্তি নেই। আসলে এগুলিই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল আমার মনে। মনে হয়েছিল, যা আমি নই,

কেন ওরা বার বার তা বলে? এভাবে ওসব কথা বলার অর্থই বা কী?

চেট্টিবাবু বললে, "ভাব করবে আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে? সত্যি?"

"সত্যি।"

"তবে ফুলের নাম কর।"

মনে হল, ক্ষতি কী? না হয় কিছুটা সময় কাটিয়েই আসি একটি মেয়ের কাছে। তারপরে ভামতীকে সে গল্প করলে হয়তো সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বলবে, তোমার দ্বারা এ হতে পারে না। তোমার লক্ষণ দেখে জানি, তুমি 'অমুক তমুক'—

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা অস্থিরতা জাগল মনে। পাছে মত বদলে যায়, তাই তাড়াতাড়ি যা মনে এল বলে উঠলাম সেই ফুলের নাম—সেবন্তী। অর্থাৎ সেঁউতি বা সেজুঁতি। ভামতী আজ এই ফুলই খোঁপায় পরেছে, দেখে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চমকে যেন সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল চেট্টিবাবুর। মুখখানা যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। বললাম, "কী হল চেট্টিবাবু?"

মুখখানা নিচু করে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "না, এর কাছে তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কার কাছে?"

যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলল চেট্টিবাবু, বলে ফেলল, "আসল নামটা, সরোজা।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, তারপরে হেসে উঠলাম হো-হো করে। বললাম, "বুঝেছি। তা হলে করব অন্য ফুলের নাম?"

উঠে দাঁড়াল চেট্টিবাবু। নবগ্রহের সেই মূর্তিগুলির দিকে একে একে তাকিয়ে তারপরে বললে, "আর কোন ফুলই বাকি নেই আজ। একটি মেয়ের শুধু ছুটি, ভারাহালু। কাল সকালে আমাদের মন্দিরে তার নাচের 'আরঙ্গেত্রম্'।"

মনে মনে কিন্তু অদ্ভুত ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে, ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটি খুশির স্রোত। উঠলাম, বললাম, "তা হলে যাই।"

"না ভাই, যেয়ো না।" চেট্টিবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার একটা হাত, বললে, "আমায় মাপ কর। ওই ফুলের নামটা শেষ পর্যন্ত কেউ করে নি দেখে মনে-মনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। দেখলে তো মানুষের মন? শেষকালে তুমি এলে, দেবতার সামনে মিথ্যাচরণ করতে পারব না। যাও তুমি তোমার সেবন্তীর কাছে।"

দুটি হাতে মাথাটি টিপে ধপ করে বসে পড়ল চেট্টিবাবু। বললাম, "তুমি কি পাগল হয়েছ বন্ধু? আমি যাব না।"

মুখ তুলল, বললে, "যদি না যাও তো বুঝব, আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা কর নি। বিশ্বাস কর, এ আমার মুহূর্তের দুর্বলতা। কী জান, ওই মেয়েটি এসে এখানকার সব-কিছু ওলোট-পালট করে দিচ্ছে।"

একটু হেসে বললাম, "অবশ্য কৌতূহল হয়। কেমন সে মেয়েটি, যে তোমার মত বিচক্ষণ বিজ্ঞ পোড়-খাওয়া মানুষকেও নাড়া দিতে পেরেছে?"

"না না, ঠাট্টা কোর না," চেট্টিবাবু বললে, "তুমি যাও। নইলে হয়তো—"

থেমে যেতেই বলে উঠলাম, "হয়তো? হয়তো—কী?"

হাত দিয়ে কপালটাকে সজোরে ঘষতে ঘষতে বললে, "তুমি যাও। যেতেই হবে তোমাকে।"

"কী বলছ!"

"বন্ধু, এই উপকারটা তুমি করো। আর-কেউ আজ আর আসবে না আমি জানি। তুমি না গেলে—শেষ পর্যন্ত হয়তো আমিই —কে বলতে পারে—হয়তো আমিই গেলাম, অতিথির মত। সে দুরবস্থা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।"

বললাম, "দুরবস্থা কেন! এতে তোমার ক্ষতিটা কী?"

উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "প্রচণ্ড ক্ষতি। আমি ওদের

পুরোহিত। আমি ওদের—। না না, ধর্মে সইবে না। সমস্তই চুরমার হয়ে যাবে। এই পাথরের নটি দেবতার দিকে তাকিয়ে দেখ, ওঁদের সাক্ষী রেখে আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা আমি ভাঙব কেমন করে!"

"সংস্কার।"

"না না, সংস্কার নয়, সত্য।"

বললাম, "জানি না। আমি ফুলের নাম করেছি মাত্র, এখনও টাকা দিই নি। অতএব কোন সত্যেই আমি আবদ্ধ নই। আমি ভিতরেই যাচ্ছি, কিন্তু তোমার ঘরে, নটরাজনের কাছে আছে তো সে?"

খোলা খাতাটার উপরে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে চেট্টিবাবু, কোন উত্তর দিল না মুখে, মাথা হেলিয়ে শুধু জানাল, "হ্যাঁ।"

সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই মনে হল, দরজার কাছ থেকে সরে গেল একটি ছায়ামূর্তি। সরে গিয়ে অদূরের থামটার আড়ালে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সবটা লক্ষ্য করে, তারপরে পা বাড়ালাম। থামটার কাছাকাছি এসে থেমে গেলাম, বললাম, "মনে হয় আমি জানি আমি কার সঙ্গে কথা কইছি। আপনার নাম—সরোজা।"

চমকে উঠলেন মহিলাটি, থামের পাশ থেকে সরে এলেন। বললাম, "আড়াল থেকে আমাদের সব কথাই আপনি শুনেছেন মনে হয়। লজ্জা পাবেন না, আমি চেট্টিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। লোকটিকে আমিও ভালবাসি।"

সেই আবছা আলোতেই আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মহিলাটি। আলপাকা-রঙের কইম্বাটুর শাড়ি পরা। বললেন, "বুদ্ধিমান লোক আপনি মনে হচ্ছে। তবে আর যা-ই করুন, আমাদের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে দয়া করে থাকতে আসবেন না।"

বলেই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পিছন থেকে বলে উঠলাম, "শুনুন।"

থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "কী?"

অদ্ভুত কিন্তু পরিস্থিতি! দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে সরাসরি এই মহিলাটির সম্মুখীন হতে হবে, এ-ও যেমন ভাবি নি, তেমনি ভাবি নি, খেয়ালের বশে ফুলের নাম করবার জেদ ধরে শেষ পর্যন্ত এমনি এক ফুলের নাম করে বসব, যে নাম হয়েছে একেবারে এই সরোজার!

চকিতে মনের কোণে একটা অভিলাষ বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে উঠল। বললাম, "একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।"

মহিলাটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "অন্য কারুর সঙ্গে এভাবে কথা বলা আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ।"

বলেই আর দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি সামনের ঘরটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওঁর ঘরের কপাটটা লক্ষ্য করলাম। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। এই-ই বোধ হয় বিধাতার নির্দেশ। নইলে, এমন ভাবে আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল কেমন করে?

দ্রুতপায়ে চেট্টিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, পকেট থেকে দুটি দশ টাকার নোট বার করে ওর সামনে রেখে বলে উঠলাম, "এই নাও টাকা। ফুলের নাম তো আগেই করেছি। যেতে পারি?"

মুখ তুলল চেট্টিবাবু। অদ্ভুত প্রসন্নতা দুটি চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত হাসির রেখা। মাথা নেড়ে জানাল, "যাও।"

দরজা তো চিনেই গিয়েছিলাম। এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজায় টোকা দিলাম। মুহূর্তে দরজাটা খুলে সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালেন সরোজা। বললাম, "নিয়মমতই এসেছি। ফুলের নাম, সেবন্তী।"

দরজায়-রাখা হাত দুখানি যেন মুহূর্তে শিথিল হয়ে পড়ে গেল। বললাম, "এবার ঘরে আসতে পারি?"

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "আসুন।"

পিছন পিছন ঘরে ঢুকে পায়ের জুতো খুলে খাটের একপাশে উঠে বসলাম। ঠিক তেমনি সাজানো একখানা ঘর। জানলার কাছে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বোধ হয় সামলাতে

পারলেন নিজেকে। তারপরে ফিরে, হাসিমুখেই কাছে এসে দাঁড়ালেন। একেবারে ভিন্ন মূর্তি! বললেন, "কী চাই? গান? নাচ?"

ততক্ষণে ইতিকর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। পকেট থেকে সেই দলিলটা বার করে ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। হাতে নিয়ে একটু আশ্চর্য হয়েই বললেন, "কী এটা!" উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "দলিল। আজ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের আপনি মালিক।"

"মানে!"

বললাম, "ঘনশ্যামদাসজী যাবার সময় এটি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা দেবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম।"

মুখে বিচিত্র হাসি, সরোজা হঠাৎ খামশুদ্ধ দলিলটা দু হাতে করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন।

"এ কী করছেন!"

ওটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। বললেন, "এ দিয়ে আমি করব কী?"

বললাম, "টাকায় আপনার দরকার নেই?"

"না।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তবে?"

"তবে কী? এই যা এখানে করছি, এ-ও টাকার জন্য, এই তো? সে টাকায় অগৌরব নেই।"

"বুঝলাম না।"

বাঁকা একটু হেসে বললেন, "বুঝবেনও না। যে বুঝবে, সে বসে আছে ওই বাইরের ঘরে, আপনার বন্ধু, ওই চেট্টিবাবু।"

চেট্টিবাবুর প্রসঙ্গেই বোধ হয় কিছু বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সরোজা, "কিন্তু, থাক্ ওসব কথা। যার কাছে এসেছেন, তার সঙ্গে কথা বলুন। আপনার কাছে আমি সরোজা নই, সেবন্তী।"

অনেক কথাই ভিড় করে আসছিল একসঙ্গে, কিন্তু জানি,

উত্তর পাব না। সরোজা সত্যিই কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।

ধীর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে গ্রহণ করবেন আমাকে?"

হেসে উঠলেন খিলখিল করে, তারপরে বললেন, "ভিন্ন নামগুলো আছে বলেই বেঁচে আছি। কিন্তু কেন তুলছেন ওসব কথা! আমার নাম আজ সেবন্তী, মনে-প্রাণে আমাকে সেবন্তী হতে দিন। সেবন্তীর মধ্যে সরোজার সব কিছু হারিয়ে যাক।"

বলে উঠলাম, "ঘনশ্যামদাসজী আপনাকে কী নামে ডাকতেন?"

মুখ তুলে তাকালেন, একটু অবাকই হয়েছেন বোধ হয় আমার প্রশ্নে। তারপরে, একটু থেমে, একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "সরোজা নয়। ডাকতে শিখিয়েছিলাম অন্য নামে। কিন্তু আবার ও-প্রসঙ্গ? কার কাছে এসেছেন আপনি? সেবন্তী—সেবন্তী! বুঝলেন?"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, "বুঝেছি। কিন্তু, যদি আমি এখন চলে যাই? না থাকি?"

ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটা হাসি টেনে এনে বললেন, "সরোজার সব কথা শুনেছেন, তাই তাকে অনুগ্রহ করতে চান? তাতে সেবন্তীর কী হবে?"

বলে ফেললাম, "আসবে অন্য লোক।"

"আর কোন লোক নেই।"

"কেন, চেট্টিবাবু?"

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেলেন সরোজা, তারপরে ধীরে ধীরে এক সময় প্রাণ সঞ্চারিত হল সেই পাষাণমূর্তিতে। বললেন, "আপনি যে চেট্টিবাবুর বন্ধু, কথায় কথায় সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

তারপরে একটু থেমে আবার বললেন, "কিন্তু কারুরই কোন উপকার করতে পারবেন না। আপনি গেলে, আর-একজন যে আসবে, এ নিয়ম নেই। চমকে উঠলাম, বললাম, "কী বললেন!"

অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর, বললেন, "আপনি গেলে যে আপনার বন্ধু আসবে, সে উপায় নেই। আমার থাকবে ছুটি, কিন্তু সেবন্তীর কী হবে? সে শুকিয়ে যাবে।"

আবার হেসে উঠলেন খিলখিল করে, তারপরে বললেন, "তার চেয়ে থেকেই যান না। মন হরণ করতে একা আপনার ভামতীই জানে না, সেবন্তীও জানে।"

"শুনেছেন তার কথা?"

"শুনেছি বই কি! আপনি সবার কথা জেনে বেড়াবেন, আপনার কথা কেউ জানবে না!"

নিরুত্তর রইলাম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে বলে উঠলেন, "কী হল! আসুন।"

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "না।"

সরোজা আরও কাছে এগিয়ে এসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমার দক্ষিণ বাহুটা। বললেন, "না কেন! আসুন না?"

নিজেকে মুহূর্তে ছাড়িয়ে নিলাম, দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, "না। মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারি নি। ও-নিয়মটা সঠিক জানা থাকলে আমি কিছুতেই ফুলের নাম করতাম না। কিন্তু সে যাই হোক; আপনি আমার একটা উপকার করবেন?"

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "কী?"

বললাম, "নটরাজন কোন ঘরে আছে দেখিয়ে দেবেন?"

আর কোন বাক্যব্যয় না করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দার বাঁ দিকে বেঁকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোন্ ঘরে যেন নৃত্যের উৎসব চলছিল, তার মৃদঙ্গ আর ঘুঙুরের শব্দের জন্য কানে আসে নি, এই দরজার কাছে আসামাত্রই শুনতে পেলাম বীণার তারের কোমল করুণ সুরের মূর্ছনা! সরোজা বললেন, "দরজা ভেজানোই আছে। ঠেললেই খুলে যাবে।"

বলে আর দাঁড়ালেন না, যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন দ্রুতপায়ে।

খাটের ওপরে সত্যিই একটি বীণা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে নটরাজন। আর অদূরে মেঝের উপরে একটি অল্পবয়সী তরুণী মেয়ে—ধবধবে সাদা শাড়ি পরা—বসে চুপচাপ শুনে চলেছে সেই বীণার সুর।

মেয়েটিই আমাকে দেখতে পেল প্রথমে। উঠে দাঁড়াল, নটরাজনকে বুঝি বললে আমার কথা তার কাছে গিয়ে।

বীণার ঝংকার থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, তারপরে হাসিমুখে বলে উঠল, "আরে, এস এস। কী সৌভাগ্য!"

"সৌভাগ্য আমার।" বললাম, "তোমার বীণা শুনব।"

মকরমুখী বিপুলকায় বীণাটি খাটের উপরে রাখা, তার সামনে বসে আছে নটরাজন, একটু হেসে বললে, "চলে এলে যে?"

"এলাম।"

"ছেড়ে দিল ভামতী?"

ভামতীর নাম উচ্চারিত হতেই সাদা-শাড়ি-পরা তরুণী মেয়েটি অস্ফুট কলরব করে উঠল, তার দিকে আমরা দুজনেই একযোগে মুখ ফেরাতে সে বলে উঠল, "কবি!"

একটু আশ্চর্য হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। আঁচল দিয়ে হাস্য গোপন করলেও চোখ দুটির হাসি সে লুকাতে পারে নি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নটরাজনের দিকে তাকাতেই সে বললে, "এ বাড়ির সবাই তোমাকে দেখে নি বটে, তবে সবাই তোমাকে চেনে। তোমার নাম দিয়েছে ওরা—কবি।"

তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বললে, "চিনেছ তা হলে ভারাহালু? এই সেই বাঙালী বাবুটি। তোমাদের কবি।"

"আমাদের কেন!" মেয়েটি তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে বললে, "ভামতীর কবি।"

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বললাম, "এরই তো কাল—"

"হ্যাঁ। আরঙ্গেত্রম্।"

"আমি দেখব কিন্তু।"

"দেখো," নটরাজন বললে, "নাচ অনেককেই শিখিয়েছি, কিন্তু সে হচ্ছে যাকে বলে মাত্র তালিম দেওয়া। কাজ-চালানো গোছের। যেটুকু শেখা দরকার, সেটুকুই ওরা শিখে রাখত। কিন্তু এই মেয়েটি মাত্র তালিম নয়, গোড়া ধরে নিয়ম করে নাচ শিখেছে। সেদিক থেকে এটিই আমার প্রকৃত প্রথম ছাত্রী। কাল দেখো, আমিই হব এর 'নট্টুভান' বা 'নৃত্যশিক্ষক' বা 'নৃত্যগুরু'ও বলতে পার।"

"কী নাচ ও শিখেছে?"

বললে, "দাসী আট্টম্। যাকে সবাই 'ভরতনাট্যম্' বলে জানে।"

"সবটা ও শিখেছে?"

"না। কিছুটা। বাকিটা শিখবে। সব ওকে শেখাব। নিষ্ঠা আছে মেয়েটির।"

"সবটা শেখে নি বলছ, অথচ 'আরঙ্গেত্রম্' হচ্ছে কী করে?"

"ওটা আর কিছুই নয়, এককথায় 'গুরুবরণ' আর কী। দেখতেই পাবে।"

বলে নটরাজন তার মকরমুখী বীণায় দিল হাত। বেজে উঠল সুর। এমন তন্ময় হয়ে সে বাজাচ্ছিল যে, ঘরে অন্য কেউ যে বসে আছে, এ তার খেয়ালও বুঝি নেই।

সুরের আলাপের দিকটা তত ভাল না লাগলেও ক্রমশ আকর্ষণ করতে লাগল আমায় সুর। সঙ্গে সঙ্গত নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে মৃদু— মাঝে মাঝে তীব্র—মাঝে মাঝে ঝড়ের গতিবেগ—অদ্ভুত একটা সুরের মায়াজাল। বোধ হয় একটানা ঘণ্টাখানেক সে বাজিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, পর্বতের গুহা থেকে প্রবল গতিবেগে যেন বেরিয়ে এসেছে কলহাস্যময়ী চঞ্চল কোন ঝরনাধারা, উপলে-উপলে মুখরিত হতে হতে

প্রপাতের মত ধাপে ধাপে সে যেন নেমে আসছে নীচে—অবশেষে এল সে সমতলে—মৃদু-মৃদু তরঙ্গ তুলে দুটি কূল ছুঁয়ে নদী হয়ে এগিয়ে চলল সে। ক্রমে ক্রমে মন্দ্রমুখর হল তার জলকল্লোল—গভীর থেকে গভীরতর—বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর—শেষ পর্যন্ত বিলীন হল সে ব্যাকুলিত সিন্ধু-তরঙ্গের আশ্লেষ-উচ্ছ্বাসে।

থেমে গেল। বললাম, "অনেক গুণ তোমার। গাইতেও পার, বাজাতেও পার। আবার নাচও জান।"

"কোনটাই সেইজন্য বেশী জানা হল না।" নিবিড় আলিঙ্গনে বীণাটিকে সে কাছে টেনে নিল, অপরূপ স্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগল, যেন প্রিয়জন তার অতি প্রিয়জনকে দীর্ঘ অদর্শনের পর আদর করছে।

অবাক হয়ে ওকে দেখছি, এমন সময় একটি ঝিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল ভারাহাল্লু, দুটি থালায় ভর্তি ফল মিষ্টি মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

দুটি আসনের সামনে দুটি থালা নামিয়ে রেখে জলের গ্লাস সাজিয়ে আমাদের দুজনকে আহ্বান জানাল ভারাহাল্লু। নিশ্চুপে খাট থেকে নেমে এল নটরাজন। আমি আপত্তি জানালাম, বললাম, "এসব কেন? বাড়ি গিয়েই তো খাব।"

নটরাজন বললে, "খাও। এ হচ্ছে প্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির থেকে ভোগ দিয়ে নিয়ে এসেছে ভারাহাল্লু। খেয়ে ওকে আশীর্বাদ কর।"

আমাদের সামনে বসে ভারাহাল্লুও মিনতির স্বরে বললে, "খান।"

অগত্যা খেতে হল। ভারাহাল্লুর নির্দেশে। একে একে সব।

বললাম, "রাত্রের খাওয়া হয়ে গেল।"

নটরাজন কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে সে বাইরে গেল। আমিও মুখ হাত ধুয়ে ভিতরে এলাম। ভারাহাল্লু আর ঝিটি চলে গেল থালা উঠিয়ে নিয়ে, মেঝেটা পরিষ্কার করে। আমি ভাবছিলাম ভামতীর কথা। পেট ভরে গেছে, আর-কিছু খেতে পারব না, তার রান্না-করা খাবার যখন মুখে তুলতে পারব না, সে তখন দুঃখই করবে না, হয়তো তিরস্কারও করবে।

ইতিমধ্যে ফিরে এল নটরাজন, বললে, "চেট্টিবাবু বাইরের ঘরেই আজ শুচ্ছে বিশ্বনাথমের পাশে। ভোর রাত্রে উঠে আবার ওকে পুজো করতে হবে কিনা ভারাহালুর জন্য। সুতরাং সারারাত এ-ঘরটা আজ আমার। সারারাত আজ বাজাব। শুনবে তো?"

বললাম, "আমাকে তো ফিরতে হবে।"

"ফিরতে হবে!" মুখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগল, তারপরে মুখ তুলে বললে, "বেশ। যেয়ো। তবে কিছুক্ষণ শুনে যাও। ঘণ্টাখানেক।"

"হ্যাঁ, তা শুনছি।"

কিছুক্ষণ বাজাবার পর বললে, "ভারাহালুকে দাসী আট্টম শেখাচ্ছি। কিন্তু ওটাই আমার জীবনের শেষ সাধ নয়। আমার সাধ অন্য।"

"কী বল তো?"

বললে, "তাঞ্জোরের কাছেই একটা গ্রামে এক 'নট্টুভান' বা 'নৃত্যগুরু'র বংশে আমার জন্ম। গান-বাজনা-নাচ অধ্যয়নের মত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিখতে হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ছিল ঘূর্ণি। বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানে এসে জীবনের ধারাটা মুহূর্তে বদলে গেল।"

থেমে গেল নটরাজন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কেটে যাবার পর ঈষৎ তরলকণ্ঠেই বলে উঠলাম, "মেয়েটি কে তা কিন্তু এখনও বল নি।"

আমার কথা ওর কানে ঠিক গিয়েছিল কি না কে জানে! নিজের মনেই বলতে লাগল নটরাজন, "সরস্বতী আম্মার স্নেহ জীবনে কখনও ভুলব না। অথচ জান?"

"কী?"

বীণার তারে একটা ঝংকার তুলে, তারই রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বললে, "এইসব মেয়েদের মতই ছিল সরস্বতী আম্মার জীবন। আজ বীণায় 'শঙ্করাভরণম্' বাজাতে গিয়ে ওঁর সেই সব কথাই মনে পড়ে গেল। উনি আমাকে স-ব বলেছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন কিনা।"

বললাম, "আমার হাতের এই আংটিটা দেখেছ ?"

একটু ঝুঁকে আংটিটা দেখতে দেখতে একসময় মুখ তুলল নটরাজন, বললে, "সরস্বতী আম্মার আঙুলে আগে থাকত। তোমায় দিয়েছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ। এটা ওঁকে দিয়েছিল কে যেন !"

"তাঁর কথাই বলছি", নটরাজন বললে, "তাঁকে দেখি নি, শুনেছি তাঁর কথা। লোকটি বিদেশী, কিন্তু সাত্ত্বিকপ্রকৃতির সেই লোক।"

মনে মনে একটু চমকে উঠলাম, বললাম, "সাত্ত্বিকপ্রকৃতি মানে ?"

নটরাজন বললে, "সাত্ত্বিকপ্রকৃতি বলতে কী বোঝাতে চান সরস্বতী আম্মা, তা তিনিই জানেন। হয়তো অসাধারণ কোন ব্যক্তি হবেন। তাঁকে ভালবেসেই সব ত্যাগ করলেন তিনি।"

"সব, মানে ?"

"সব, মানে এই জীবন। তাঁর এই কন্যাটিকেও ত্যাগ করেছিলেন, বলা যায়। ওই যে বাসাটিতে তুমি গিয়েছিলে, ওই বাসাটি নিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই লোকটি ছিল খেয়ালী, খেয়ালের বশে যেমন এসেছিল, তেমনি একদিন হঠাৎই চলে গিয়েছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর থেকে এই এত বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা কেটেছে সরস্বতী আম্মার জীবন। 'বঞ্চিত সত্ত্বা' বলতে পার। কিন্তু কখনও—কোনদিন—কোনও অভিযোগ শুনি নি কারুর বিরুদ্ধে। পূজা-অর্চনা নিয়েই আছেন সব সময়। কতদিন দেখেছি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দেবমুর্তির দিকে, চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। এক এক সময় ভাবতাম, এ আধ্যাত্মিক সম্পদ উনি পেলেন কী করে ?"

বললাম, "তোমার সঙ্গে আলাপ বুঝি এইখানে ? কেমন করে হল ?"

"সে অনেক কথা," নটরাজন বললে, "সেই যে মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছিলাম—"

"হ্যাঁ," বলে উঠলাম; "সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তোমার প্রণয়িণী সেই মেয়েটি কে ?"

"প্রণয়িণী ?" নটরাজন বললে, "না। সে কথা আর বলা চলে না। তবে সেদিন আমার ভালবাসার কথা জানতে পেরে সরস্বতী আম্মা নিজেই এসে একদিন আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। কী অপূর্ব স্নেহপ্রবণ মন! বললেন, বাবা, আমার কাছে এসে তুমি থাক।"

"কিন্তু মেয়েটি কে ?"

নটরাজন একটু থেমে, তারপরে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলে, "ভামতী।"

হঠাৎ মনে হল, চারিদিক অদ্ভুত নির্জন হয়ে গেছে। যত সংক্ষেপে আর সহজে নটরাজনের কথা আমি বলতে পারলাম, অত সংক্ষেপে, অত সহজে, সে আমাকে ও-কথা বলে নি। অনেক সময় নিয়ে, অনেক দ্বিধা করে, অনেক ভূমিকার পরে, সে উদ্ঘাটিত করেছিল তার মনোরাজ্যের স্মৃতিভাণ্ডারটুকু।

রাতও বোধ হয় অনেক। নাচের শব্দও কানে আসছে না, কোনও গানের সুরও আর শোনা যায় না। শুধু নটরাজনদের ঘরের খোলা জানলাটার বাইরে স্বর্ণ-চাঁপা গাছটার উপরে চাপা জ্যোৎস্নার আলো এসে ঠিকরে পড়েছে, ঝিরঝিরে একটা হাওয়া লেগে পাতাগুলি কাঁপছে, আর ভেসে আসছে পাতায়-পাতায় ঢাকা প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মৃদু সৌরভ।

কোথাও কোন কোলাহলের সুর নেই, একটা রাত-জাগা পাখির ককিয়ে-ওঠাও শোনা যায় না, অপরূপ নিস্তব্ধতায় ভরে গেছে চারিদিক। নটরাজনের পাশে খাটের উপরে আমিও বসে আছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমারও যেন আর-কিছু করবার নেই, উঠে চলে যাবারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, মগ্ন করে রাখা।

হঠাৎই বীণার তারে ঘা দিল নটরাজন। গমকে-গমকে মীড়ে-

মীড়ে যেন দুঃসহ এক অন্তর্বেদনাই মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে! জানলার বাইরে আকাশ আর চাপা-জ্যোৎস্নার আবছা আলোছায়ার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর মনে হল, বিচ্ছেদময়ী রাত্রিই বুঝি বুকফাটা কান্নায় গুমরে মরছে!

বহুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর চোখ ফেরালাম নটরাজনের দিকে। নিমীলিত দুটি চোখ, মুখের ভাবে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা—সুর-পরিবর্তন করে বসন্ত-জাতীয় কোন প্রাপ্তি-প্রমত্ত সুরের রাজ্যে অবগাহনে নেমেছে সে যেন! ওই-জাতীয় সুর বেহালায় বা এস্‌রাজে আমাদের দেশেও শুনেছি, কিন্তু বীণার তারে যে স্বাভাবিক স্বর জাগে, তা যেন আপনিই মাদকতায় ভরা—সেই স্বরে আবার জেগেছে ওই সুর—সমস্ত মনটাকে যেন মুহূর্তে মাতিয়ে দিল।

বীণাটিকে আঁকড়ে ধরেছে সে মদমত্তা কোনও রমণীর মত। মনে হচ্ছিল, মাত্র একটি যন্ত্রই নয়, যেন কোনও প্রেমিকা নারীর সুসম দেহ-বীণায় পরম প্রেমভরেই সুর তুলেছে নটরাজন। কত দণ্ড পল অনুপল এমনভাবে যে কেটে গেল কে জানে! একসময় সে বাজানো থামিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ বীণাটিই দু হাতে জড়িয়ে ধরল অতি আদরে। তারপরেই গভীর তৃপ্তিভরেই মাথাটা রাখল বীণার এক দিকে।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল ওর ভাবভঙ্গি। বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি। একসময় ও মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাকই হল। হঠাৎ যেন ততক্ষণে তার স্মরণে এল আমার উপস্থিতি। অপ্রতিভের মত একটু হেসে, বীণাটি অতি সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে নেমে দাঁড়াল খাট থেকে।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কটা বেজেছে?"

হাতঘড়ি দেখে জবাব দিলাম, "তিনটে বেজে গেছে।"

শশব্যস্তে আলনার দিকে এগিয়ে কিছু কাপড়-চোপড় এবং কী কী যেন হাতে তুলে নিল, তারপরে এল আমার কাছে, বললে, "ওঠ। না হলে দেরি হয়ে যাবে।"

"কীসের ?"

অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "তুমি ন'ম দেখি খাট থেকে।"

নামলাম। বললে, "এস, স্নান-টান সব সেরে ফেলি। এর পর মেয়েরা উঠে পড়বে, তখন মুশকিল হবে।"

"কেন ?"

বললে, "আজ ভারাহালুর 'আরেঙ্গত্রম্,' মনে নেই ? শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সেই সরোবরে সবাইকে স্নান করতে হয় আজ। এস এস— আর দেরি কোর না।"

"আমিও স্নান করব নাকি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"ঠাণ্ডা লাগবে যে !"

"লাগবে না। এস। গঙ্গার লুকানো ধারা ওতে এসে মিশেছে বলে সবার বিশ্বাস।"

বাইরের ঘরের দরজাটা খোলা। তক্তাপোশের উপর শুধু বিশ্বনাথম্ই শুয়ে আছে, চেট্টিবাবু নেই, একটা বালিশ শুধু পড়ে আছে বিশ্বনাথমের মাথার পাশে।

বিশ্বনাথমের ঘুম ভাঙিয়ে ওকে বলব নাকি, সরোজার সঙ্গে আমার আর দেখা করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তার সঙ্গে প্রয়োজন আমার মিটে গেছে।

কিন্তু থাক্, আরতির সময় মন্দিরে না গেলেই হল। ক্রমে ক্রমে বিশ্বনাথম্ সবই বুঝতে পারবে।

নটরাজন বললে, "দেখলে ? চেট্টিভাইয়ার স্নান বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হয়ে এল।"

টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চলল সেই সরোবরের তীরে। এগলি-সেগলি করে অন্ধকারে কীভাবে যে আমাকে পার করে আনল, ও-ই জানে। সরোবরের ঘাটে রানার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। আমরা যতক্ষণে পৌঁছলাম, দেখি চেট্টিবাবুর স্নান সত্যিই সারা হয়ে গেছে।

নটরাজনকে দেখে বললে, "শীগগির সেরে নাও। মেয়েরা এসে পড়বে এখ্খুনি।"

তারপরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "তোমাকেও ধরে এনেছে বুঝি? নাও, তুমিও স্নান কর। 'আরঙ্গেত্রম্' দেখবে তো? মন্দিরে অস্নাত যেতে নেই।"

নটরাজন বাড়তি কাপড়চোপড়-গামছা এসব এনে দিল স্নানের জন্য—তেল আর সাবান পর্যন্ত ভোলে নি। হাতে এগিয়ে দিল একটা নিমের দাঁতন। বললে, "শীগ্‌গির।"

চেট্টিবাবু বললে, সারারাত জেগেছে তো নটরাজনের পাল্লায় পড়ে!"

"তুমি জানলে কী করে!" প্রশ্ন করে, তারপরে একটু হেসে বললাম, "বাস্তবিক, কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল, নিজেই বুঝতে পারি নি।"

"তাই-ই হয়," চেট্টিবাবু বললে, "ওর বীণায় এমনি জাদু। আমরা একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলে যে, আমরা আর তোমার ধ্যান ভাঙি নি।"

"তোমরা!" বললাম, "তুমি আর সরোজা?"

"না," চেট্টিবাবু বললে, "আমি আর ভামতী।"

"ভামতী!"

"অবাক হচ্ছ কেন? ও এসেছিল তোমায় ডাকতে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ।"

বললাম, "তা ডাকল না কেন?"

চেট্টিবাবু বললে, "আমিই বারণ করলাম। ও বললে, খেয়ে আসে নি যে। বললাম, ভারাহালু প্রসাদ খাইয়েছে।"

আমি বলে উঠলাম, "বাস্! তোমার কথা শুনেই চলে গেল?"

"গেল। কিন্তু বোধ হয় রাগ করেছে," চেট্টিবাবু কণ্ঠস্বর নামিয়ে একটু কৌতুক করেই বলে উঠল, "মান ভাঙাতে হবে তোমাকে।"

চুপ করে রইলাম।

চেট্টিবাবু বললে, "মন্দিরে দেখা হবে ওর সঙ্গে তোমার। ও-ও আসবে তো। দেখলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আমি যাই। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এস।"

বাইরে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা থাকলেও সরোবরের জলটা গরম। স্নানাদি সেরে, লণ্ঠন হাতে ফিরে এলাম আমরা, বিশ্বনাথম্ ততক্ষণে উঠে বাইরে গেছে, চেট্টিবাবু নবগ্রহের পুজো সেরে নিচ্ছেন, মেয়েরা তখনও কেউ ওঠে নি।

আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসলাম। ভিজে কাপড়গুলি বাইরের উঠানে তারে মেলে দিয়ে এল নটরাজন। তারপরে খাটের উপর বসল এসে কাছে। বললে, "ভারাহালু উঠেছে। এইবার সবাই উঠবে একে একে। স্নানে যাবে।"

বললাম, "কাল রাত্রে অদ্ভুত এক মূর্তি দেখলাম তোমার।"

বললে, "অদ্ভুত কিছু নয়, তবে তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে?"

"কী বুঝব?"

মুখের দিকে তাকাল, একটু হেসে বললে, "বোঝ নি বুঝতে পারছি। কিন্তু বোঝাবই বা কী করে?"

"কী? বলতে চাইছ কী?"

বললে, "ভামতীর কথা বলছিলাম। কিন্তু আজ আমার মনে সে নেই। তাকে ভুলতেই বীণা নিয়েছিলাম তুলে, আজ ওই বীণা আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে আছে। যে-কোন মেয়ের সঙ্গ থেকে ঢের বেশী আনন্দ দেয় ও।"

বলে সামনে-রাখা বীণার তারে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল।

বললাম, "তুমি জিতেন্দ্রিয়।"

"না," মুখ তুলে বললে, "সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে বীণাটিকে ভালবাসি। বড় যত্নে রাখি। ভেঙে গেলে আমি মরেই যাব।"

একটু থেমে আবার বললে, "সরস্বতী আম্মার ঘরে রেখেছিলাম, নিভৃতে বসে বাজাতাম। হল সরস্বতী আম্মার অসুখ, বাড়ল ভিড়,

বীণা নিয়ে এসেছি এখানে। ওকে বাজালে, আমার দেহ-মন-প্রাণ সব মেতে ওঠে।"

বললাম, "মন-প্রাণ তো বুঝলাম, কিন্তু 'দেহ' কথাটা ব্যবহার করছ কেন?"

অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটি ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললে, "পুরুষে পুরুষে কথা বলছি। একথা মেয়েরা বিশ্বাস করবে না। বন্ধু, এই বীণায় যখন সুর তুলে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যাই, তখন আমার মন নয়, দেহটা পর্যন্ত মত্ত হয়ে ওঠে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কানে কানে শুনবে? পুরুষ স্ত্রীকে ভালবেসে যা পায়, আমি তা পাই এই আমার বীণার কাছ থেকে।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দির নয়, ওদেরই 'পল্লী'র মধ্যে, একটি ছোট্ট মন্দির, এ মন্দিরের দেবতাকে ওরা 'পুরুষোত্তম' বলে ডাকে। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে যে নাটমন্দির, সেখানেই শুরু হল ভারাহালুর 'আরঙ্গেত্রম্'।

সব মেয়ে আমাকে চেনে মনে হল, আমি অনেককেই চিনি না। একটা সাদা কালো-পাড় সিল্কের শাড়ি পরে হাতে পুজোর থালা নিয়ে গর্ভগৃহের দিকে চলে গেল ভামতী। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে সাড়া দিল না, আমাকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গর্ভগৃহ থেকে ভারাহালুকে সঙ্গে নিয়ে নাটমন্দিরে পৌঁছে দিয়ে আবার সে ফিরে গেল যথাস্থানে। দেবতার সামনে পুরোহিতের পায়ের কাছে বসে রইল।

ততক্ষণে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো এসে পড়েছে মন্দির-চত্বরে। মাঝে অনেকখানি জায়গা রেখে পাশে পাশে বসেছে সবাই, দেবতার দিকে যথাসম্ভব মুখ করে। পাঁচজন বাজিয়ে বসে আছে যন্ত্র নিয়ে। একজন মৃদঙ্গ, একজন বাঁশী, একজন সারেঙ্গী, একজন সেতার, আর

একজন নিয়ে বসেছে এসরাজের মত একটা যন্ত্র, তার একটা দিকে ময়ূরের মূর্তি বসানো, ওরা বললে, যন্ত্রটির নাম—তাউস্।

আমাকে পাশে নিয়ে এক দিকে বসে আছে নটরাজন হাতে ছোট্ট একজোড়া খঞ্জনি নিয়ে। পরনে ভারাহালুরই দেওয়া সিল্কের ধুতি, পাঞ্জাবি আর চাদর। অন্য দিকে একান্তে বসে আছে চেট্টিবাবু। চন্দনচর্চিত ললাট, খালি গা, পরিধানে পট্টবস্ত্র। যন্ত্রীরাও তাই, খালি গা, পরনে পট্টবস্ত্র, ললাট চন্দনচর্চিত।

নৃত্যারতির আরম্ভে একটি মেয়ে প্রত্যেকের কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে গেল, এমন কি আমার কপালেও। মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বেজে উঠতেই একযোগে সবাই প্রণাম জানাল দেবতাকে। পূজা শেষ। এইবার 'নৃত্য' শুরু হবে। সমস্ত মন্দিরটাই ভরে গেছে সুবাসিত ধূপ আর ধুনোর গন্ধে।

আলপাকা রঙের রেশমী কাপড় পরেছে ভারাহালু নাচবার উপযোগী করে। দুটি পা পেঁচিয়ে কাপড়ের দুটি প্রান্ত কটিদেশ বেষ্টন করে উঠেছে। একটি প্রান্ত তারপরে দু ভাঁজ হয়ে মেখলার মত জড়ানো। অপর প্রান্ত, অর্থাৎ যেটি আঁচলের দিক, সেটি কোমর ছাড়িয়ে পিঠ দিয়ে বাম কাঁধে উঠে, আবার নেমে, বুকে কিছুটা ছড়িয়ে গিয়ে কটিবন্ধ ছাপিয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ছত্রাকার পাখার মত। পায়ে ঘুঙুর, কটিতে জরির-কাজ-করা কালো ভেলভেটের বন্ধনী, গলায় হার, হাতে দুগাছি করে চুড়ি, বাহুমূলে বাজুবন্ধ, নাসিকায় আর কানে হীরের মত দ্যুতিময় শুভ্র পাথরের বিন্দু, শিরে—সিঁথিতে সোনার টিকুলি, বেণীবদ্ধ কেশরাশির মূলে একগুচ্ছ সেউঁতি ফুল, গায়ে আলপাকা রঙেরই চোলি।

রাত্রে প্রথম দর্শনে মেয়েটিকে একটু চটুল ধরনেরই মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই চটুলতা? ধুনুচিতে বাতাস করলে ধোঁয়া যেমন এঁকেবেঁকে চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, মেয়েটির নৃত্যভঙ্গি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, এঁকেবেঁকে তেমনি করেই যেন দেবতাকে আরতি করছে সে।

একসময় আমার কানে কানে নটরাজন বললে, "প্রাচীনকালে 'দাসী' তিন রকম ছিল। 'রাজদাসী' 'দেবদাসী' আর 'স্ব-দাসী'। নাটমন্দিরের সামনে 'ধ্বজদণ্ড' বা 'গরুড়স্তম্ভ' দেখলে না? ওর সামনে নাচত যারা, তাদের বলত 'রাজদাসী'। দেবতার সামনে যারা নাচত, তারা 'দেবদাসী'। আর 'স্ব-দাসী'রা নাচত বিশেষ কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাত্র। এরা নাকি ওর তিনটের একটাও নয়, এরা হচ্ছে 'দেববধূ'। এরা এসব নাচের জন্য নয়। এদের নাচ ছিল মাত্র 'লাস্যভাবে'র নাচ। মালাবারের কথাকলির কিছুটা প্রভাব আর তাঞ্জোরের মন্দির-নৃত্যের কিছু প্রভাব, এই দুই মিলিয়ে ছিল 'মোহিনী আট্টম'। সরস্বতী আম্মার কাছে শুনেছি, 'মোহিনী আট্টম' ছিল 'দেববধূ'দের নাচ। অবশ্য এসব প্রাচীনকালের কথা।"

মাথার উপরে দুটি হাত জড়ো করে এবং কখনও বা হাত দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, চোখে আর হাতের ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে, মাথা নাড়িয়ে, পায়ের ছন্দে তাল রেখে, চমৎকার নাচছিল ভারাহালু। নটরাজন বললে, "একে আমরা বলি আলারিপ্প্ু, তেলেগুতে বলে, আলারিম্পু। কথাটার মানে হচ্ছে, ফুল দিয়ে সাজানো।"

বললাম, "তা ঠিক। মেয়েটি যেন নৃত্যভঙ্গিতে ফুল দিয়েই তার দেবতাকে সাজাচ্ছে।"

বললে, "সবই ও অল্পে অল্পে দেখাবে।"

কিছুক্ষণ পরেই দেখি, দুটি মেয়ে বসে বসে অনেকটা আমাদের তানমালার মত কী সব শব্দ উচ্চারণ করছে সুরে সুরে, আর নটরাজন নিজে উচ্চারণ করছে 'বোল', আর সঙ্গতি রেখে মেয়েটি নাচছে নানান ভঙ্গিতে—

এক সময় থেমে গেল মেয়েদের সুর, থেমে গেল নটরাজন। তারপরে নটরাজন বললে, "যেটা হল, একে আমরা বলি, যতিস্বরম্। সঙ্গে কী সুর শুনলে? তোড়ি-বসন্ত। এবার 'পদম্' শোন।"

এবার আর-একটি মেয়ে শুরু করলে গান, সেই গানের ভাবকে মুখের ভাবে ও অঙ্গভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে লাগল ভারাহালু।

নটরাজন বললে, "এই সুরটিকে আমরা বলি, 'আনন্দ ভৈরবী'।"

ভারাহালুর নাচের তালে তালে মেয়েটি গাইছে, "মাঞ্চি দিনমু..." সুন্দর দিন! কেন সে আমার চোখের আড়ালে গেল? আড়াল থেকে সে আমাকে দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তাকে। সখী, তাকে আসতে বল। তাকে আমি বুকের নিধি করে রাখব। সখী, আমি কি তারই নই? আসছে না কেন? বল, যে আমাকে অত ভালবাসে, তাকে আমি ছাড়ব কেমন করে?

নাটমন্দির থেকে দেবতার দিকে মুখ করলে সামনে পড়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই মূল মন্দির, প্রথমে চত্বর, তারপরেই গর্ভগৃহ। ফুলের মালায় শোভিত হয়ে রূপোর পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে, মাথার উপরে চন্দ্রাতপ।

ভারাহালুদের 'পদম্'এর শেষ চরণটি শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ গেল গর্ভগৃহের দিকে। দেখি, চত্বরের এক কোণ ঘেঁষে এমন-ভাবে বসে আছে ভামতী, যাতে করে সহজেই দেখতে পায় আমাকে।

আমাকেই সে দেখছিল নিষ্পলক চক্ষু মেলে। চোখে চোখ মিলে যেতেই তাড়াতাড়ি নত করেছে মুখ, যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব করে সামনের থালায়-রাখা ফুল নৈবেদ্যর সঙ্গে সাজানো ধূপদানিটার নিবে-যাওয়া ধূপে করতে লাগল শিখা-সংযোগ; অদূরের অতিকায় প্রদীপ-শিখাটি থেকে শলাকা দিয়ে ধূপের শিরে শিখান্তর।

শেষ হয়ে গেল 'আরঙ্গেত্রম্'। মেয়েরা এসে হাতে হাতে প্রসাদ দিল। বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, এবার যে-যার ফিরে যাওয়ার পালা, আমার চোখ কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ভামতীকেই অনুসরণ করছে। গর্ভগৃহেই কিছুক্ষণের জন্য তাকে দেখলাম কী কী সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। তারপরে হঠাৎ সে গেল ভিড়ে হারিয়ে। নটরাজন আমার হাত ধরে বললে, "চল, ঠাকুর প্রণাম করে আসি।"

"চল।"

চেট্টিবাবুও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একসময় নিম্নকণ্ঠে বললে, "এ মন্দির পুরনো নয়। প্রাচীন স্থাপত্যের কোনও নিদর্শন নেই।

কংক্রীটে তৈরী। ঘনশ্যামদাসজী অনুগ্রহ করে 'দেবীপল্লী'র জন্য করে দিয়েছেন। মূর্তিও তৈরি করে আনিয়েছেন কাশী থেকে।" মেয়েরা এদিক-ওদিক দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, প্রণাম করে চলেই যাচ্ছে এবার। কিন্তু কোথায় ভামতী ?

নটরাজন আমার হাত ধরে বললে, "চল। এবার মূল শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে। সবাই প্রণাম করতে যাচ্ছে।"

"চল।"

মূল মন্দিরেও সে নেই। তার অন্য সব মেয়েদের নিয়ে চেট্টিবাবু প্রণাম সেরে চলে গেল। আমরাও চলে আসছিলাম। নটরাজন হাত ধরে টেনে বললে, "এস।"

"কোথায় ?"

"এসই না ?"

মন্দিরের পাশের সেই ঝিলটা। বাঁধাঘাট ছাড়িয়ে সে ঘাটের বিপরীত দিকে নিয়ে এল। হঠাৎ দেখতে পেলাম বিশ্বনাথম্‌কে। চোখে তার সেই পুরু কাচের চশমাটা নেই, ভাল দেখতেও পাচ্ছে না বোধ হয়, আন্দাজে আন্দাজে পা ফেলে চলছে। স্নান-টান সেরে পট্টবস্ত্র পরে একটা কলাপাতার ঠোঙায় বাগান থেকে নানান ফুল তুলছে, সঙ্গে একটি মেয়ে। দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু এত সকালে ওরা ওখানে কেন ?

ওইদিকে নটরাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "কী ব্যাপার !"

নটরাজন বললে, "ওসব বুঝবে না। চেট্টিবাবুর ব্যাপার। পূজা-অর্চনা বার-ব্রত এসব লেগেই আছে। আমি ওসব জানিও না বুঝিও না, তবে শ্রদ্ধা করি চেট্টিভাইয়াকে, সে তো তুমি জান।"

গাছপালার আড়ালে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলিতে আমরা বসলাম।

কিছুটা দূরেই সেই বৃদ্ধ বেলগাছটা, যার পায়ে এসে আমি ভামতীরই লুকিয়ে-রাখা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম। জিজ্ঞাসা করতাম, "কী নাম হবে তোমার কাল ?"

মুচকি হেসে বলত, "বৃদ্ধ বেলগাছের পায়ে গিয়ে সাধ্য সাধনা কোর, জানতে পারবে।"

গাছটার দিকে তাকাতে তাকাতে সেই 'সাধ্য-সাধনা'র কথাই মনে পড়ছিল। আর আশ্চর্য হচ্ছিলাম নিজের শরীরের অবস্থা দেখে। কাল সারাটি রাত ঠায় জেগে কাটিয়েছি, কিন্তু তা বলে শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে না তো শরীর, ঘুমেও তো আসছে না চোখ জড়িয়ে। তবে কি ঝিলের জলে রাত থাকতে উঠে স্নান করারই ফল এটা? ওই তো সেই বাঁধাঘাট, যেখানে লণ্ঠনের আলোয় স্নান করেছিলাম কাল রাত্রে।

চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছিল নটরাজন, হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "কী ভাবছ?"

"কিছু না।"

বললে, "তোমাকে কয়েকটা কথা বলব বলে ডেকে আনলাম। অবাক হয়েছ কাল রাত্রে আমার অবস্থা দেখে, না?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ও কী বলতে চায়! তবু সরাসরি কথাটা না তুলে বললাম, "খুব আশ্চর্য হই নি। ভামতী ভালবাসার মতই মেয়ে।"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ছি-ছি, সে-কথা আমি বলি নি। সে মালা ছিঁড়ে গেছে বহুদিন, সে উন্মাদনা আর অনুভবও করি না। আমার সমস্ত মন ছেয়ে থাকে ওই বীণা আর ওর সুর। আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি। অবাক হও নি তো?"

বললাম, "খুব না। কী একটা বিদেশী পত্রিকায় যেন একবার পড়েছিলাম এক বিদেশী বেহালা-বাদকের কথা। তার কাছে তার বেহালাটাই ছিল যেন এক তরুণী নারীশরীর। বেহালায় হাত দিয়ে সে যেন তার প্রিয়তমারই স্পর্শসুখ অনুভব করে।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল নটরাজন, "তা হলে সত্যিই এটা হয়! আমি পাগল হয়ে যাই নি তো! মাঝে মাঝে মনে হত, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো অদ্ভুত লোক! এই

শুনতাম, অরসিক বিজ্ঞানী তুমি, মাটির নীচে কোথায় লোহা আর কোথায় কী পাথর, এই সবেরই খোঁজ করে বেড়াও, এখন দেখছি, রসের খোঁজও রাখ। বিদেশী বেহালা-বাজিয়ের খবরও তো রেখেছ দেখছি!"

ঈষৎ লজ্জিত হয়েই বলে উঠলাম, "ও কিছু নয়। হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল পত্রিকাটা। আসলে কাঠখোট্টা মানুষ আমি, লোহার কোদালকে কোদাল বলাই আমার অভ্যাস। আজেবাজে স্বপ্ন দেখি না।"

"কিন্তু আমি দেখি।" নটরাজন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "সেটা বলব বলেই ডেকে আনলাম তোমাকে। আমি তামিলনাদের লোক, ভারাহালুকে আমাদের তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্ শিখিয়ে আমার সুখী হবারই কথা। তুমি তো জান, আমার স্বপ্ন— ওদের মধ্য থেকে আমি গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলব। কিন্তু তার থেকেও বড় সাধ, বড় স্বপ্ন আমার আছে।"

"কী?"

বললে, "অন্ধ্র মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে সারা অন্ধ্রদেশটাকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভরতনাট্যমেরই একটি প্রায় অপ্রচলিত প্রাচীন ধারাকে অন্ধ্রদেশ ধরে রেখেছে। বহু যত্নে সেই ধারাকে আমি আয়ত্ত করেছি। আমি সেই ধারায় শিক্ষিত করে যেতে চাই এদের অন্তত একজনকেও।"

"কেন?"

"প্রচার হোক এই ধারার। যদিও এ নাচ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের 'দাসী আট্টম্' যেমন পুরুষরা শিখছে, এ নাচটাও মেয়েরা শিখুক, ক্ষতি কী? কিন্তু বড় শ্রমসাধ্য সে নাচ। বড় যত্ন, বড় নিষ্ঠার দরকার। আমার শরীর ঠিক তার উপযুক্ত নয়, এ নাচের উপযোগী দেহে চাই সুগঠিত মসৃণ দেহলাবণ্য। যার মধ্য দিয়ে এ নাচ বেঁচে থাকবে, যার মধ্য দিয়ে এ নাচের প্রকৃত রূপায়ণ দেখতে পাবে লোকে।"

বললাম, "কিন্তু নাচটা কী ?"

বললে, "কৃষ্ণানদীর অববাহিকায় প্রাচীন একটি গ্রাম আছে, তার নাম, কুচিপুডী। প্রায় চার শো বছর আগের সৃষ্টি এই নৃত্যধারা। তাঞ্জোরপ্রবাসী এক তেলেগু ব্রাহ্মণ, তীর্থনারায়ণ, তিনিই এর মূল প্রেরণা। পরম ভক্ত ছিলেন তিনি, গান করতেন 'গীতগোবিন্দম্,' তোমাদেরই দেশের কবির রচনা। এঁরই শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী রচনা করেছিলেন 'পারিজাত-অপহরণ' নামে এক নৃত্যনাট্য। তাঞ্জোর থেকে কুচেলাপুরমে এসে (তখন 'কুচিপুডি'র নাম ছিল 'কুচেলাপুরম্') ওখানকার ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে শুরু করলেন সেই নৃত্যনাট্য-প্রদর্শনী। এই নৃত্যধারারই নাম, 'কুচিপুডী' নৃত্য। এই নৃত্যের মূল প্রেরণা কিন্তু তোমাদেরই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'। পরে 'ভাগবতে'র আরও উপাখ্যান গ্রহণ করা হল। 'পারিজাত-অপহরণ' বা 'ভাম-কলাপম্' তার মধ্যে বিশেষ একটি।"

কথাটা শুনে একটু চমকেই উঠলাম এতক্ষণে, বললাম, "কী বললে, ভাম-কলাপম্ ?"

"হ্যাঁ। শুনেছ নাকি কথাটা ?"

"শুনেছি। ভামতীর কাছ থেকে।"

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, বললে, "ভোলে নি তা হলে ?"

"কী ?"

নটরাজন বললে, "ভামতীর সুসম শরীরই এই নাচের উপযুক্ত। 'সত্যভামা'র ভূমিকায় এখানকার এত মেয়ের মধ্যে মানায় মাত্র ওকেই।"

"শেখাও না কেন ?"

মুখ নিচু করল নটরাজন, কেমন বিরস বিবর্ণ মুখে বললে, "শিখতে চায় না।"

"কেন ?"

"কে জানে !" বলেই ফিরল আমার দিকে, "তুমি ওকে কত

ভালবাস জানি, কিন্তু দেখো যেন ওর ওই অপূর্ব দেহছন্দ ভেঙে না পড়ে। স্বাস্থ্য নইলে এ নাচ হয় না, প্রচুর দম না থাকলে এ নাচে সফল হওয়া যায় না।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম, "নটরাজন!"

"কী?"

"তুমি ওকে চাও, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ কর কেন?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠল নটরাজন, "না ভাই, সেটা সত্য নয়। বিশ্বাস কর, উপভোগে আমার রুচি নেই, আমার রুচি শিল্প-সৃষ্টিতে।"

বললাম, "ভালও ওকে বাস তুমি মনে মনে।"

বললে, "মনে-মনেই যদি তা থেকে থাকে, বাহ্যিক প্রকাশ যদি তার না ঘটে থাকে, তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে?"

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, "কিছুমাত্র না। ওই যে বীণা তুমি রাত্রে বাজাও, ও তোমার ভামতীরই প্রতীক।"

বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল নটরাজন।

কী মনে করে চেট্টিবাবুর কাছে আর গেলাম না, গেলাম না ভামতীর বাসাতেও, দরজার কাছে গিয়েও ফিবে এলাম। কী এক প্রচ্ছন্ন অভিমান বুকে বয়ে ফিরে এলাম নিজের বাসায়, রামদাসজী আর পান্থলুর সংস্পর্শে।

দুজনে বোধ হয় ঘনশ্যামদাসজীর সেই চাদর-পাতা গদিতেই বসে বৈষয়িক কথাবার্তায় মগ্ন। আমার আসাটা ওরা বোধ হয় প্রথমটায় লক্ষ্য করে নি। আমি দোতলার সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেও আবার নেমে এলাম। ভঙ্গিতে একটা খুশির আমেজ এনে হাঁকডাক করে উঠলাম, "কই, পান্থলু এসেছ নাকি? রামদাসজী কোথায়?"

বন্ধ হয়ে গেল ওদের কথাবার্তা, আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। রামদাসজী সমাদরে আহ্বান জানালেন, "আসুন বাবুজী।"

বললাম, তেমনি সতেজ আর উৎসাহপূর্ণ আমার কণ্ঠস্বর,

"রামদাসজী, আমার প্রস্‌পেক্‌টিংয়ের কাজ বহুদিন হল পড়ে আছে, আজ আমি বেরিয়ে পড়বই। জনা তিনেক কুলি তুমি সংগ্রহ কর তো পাম্বলু।"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন রামদাসজী, বললেন, "সে হবে 'খন। এই বোধ হয় এলেন, আগে একটু বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রাম আমার হয়ে গেছে, আমি এখুনি বেরুতে চাই। চা খেয়েই।"

রামদাসজী বললেন, "তা হলে এখানেই চা খান। আমি ভজুয়াকে বলি।"

বললাম, "চা খান আপনি? আপনার বাবা কিন্তু খেতেন না।"

হেসে উঠলেন রামদাসজী, "বাবা সেকেলে মানুষ।"

একটু পরেই রামদাসজীর খাস চাকর চা করে নিয়ে এল। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাউরুটির টোস্ট আর কিছু বিস্কুট।

বললাম, "সবই নব্য আয়োজন দেখছি।"

রামদাসজী একটু হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না।

খেতে খেতে বললাম, "আপনার বাবার সেই পোষা ইঁদুর বাচ্চুর কথা মনে পড়ছে। এমনি সকালবেলা ডাকলেই সে আসত।"

"না বাবুজী," রামদাসজী বললেন, "গণেশজীর বাহন হিসাবে ইঁদুর পোষার সংস্কার আমার নেই। কিন্তু সে কথা থাক্‌। প্রস্‌পেক্‌টিংয়ে যে যাবেন, তার আগে আপনার সঙ্গে আমার একটু জরুরী পরামর্শ আছে।"

"বলুন?"

"বলছিলাম কি, প্রস্‌পেক্‌টিং করে আর কী হবে? এখানকার ব্যবসা ফলাও করার ইচ্ছা আমার নেই।"

ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম, বললাম, "তার মানে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির ব্যবসা করার ইচ্ছে আপনার নেই।"

"আছে। যে-কোয়ারিতে আপনি পরীক্ষা করেছেন, ওই কোয়ারিই যথেষ্ট। কোয়ারি আর বাড়াতে চাই না।"

কিন্তু আমার মন যা সেই মুহূর্তে চাইছিল, সে হল কাজ। যত সত্বর সম্ভব কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া। কেন তা জানি না, কাজের নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "বেশ। কিন্তু আমি প্রস্পেকিটিং বন্ধ করব না। ওই পাহাড় অঞ্চলটায় ভাল পারসেণ্টেজের 'ম্যাঙ্গানিজ ওর' পাব বলে আমার বিশ্বাস। আমি আরও স্যাম্পল্ তুলে আমার হেড-অফিসে পাঠাব, তারা অন্য পার্টি খুঁজবে। আপনি ও-অঞ্চলটা 'লীজ' নিয়েছেন, একটা 'ট্যাক্স' আপনি পাবেনই।"

"সে-কথা ভাবছি না বাবুজী।" বলতে বলতে রামদাসজীও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "ব্যবসাতে টাকা ফেলতে কসুর করব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অন্য কথা। 'ম্যাঙ্গানিজ ওর' আমাদের ন্যাশনাল ওয়েল্‌থ, এ-কথা মানেন তো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"বিদেশী সওদাগর এসব নির্বিচারে বাইরে চালান দিত, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা তা করব কেন ? 'ওর' চালান দিতে দিতে একসময় দেউলে হয়ে যাব না ?"

বললাম, "হাসালেন আপনি। ভারতবর্ষ অঢেল দিতে পারে। কত নেবে নিক না ওরা।"

"এ-কথা অনেক কাল আগে, যখন প্রথম আসতে লাগল বিদেশী সওদাগর তখন ভেবেছিল সবাই। ভেবেছিল, কত নেবে, নিক না। ভারতবর্ষে মণি-মাণিক্যের অভাব আছে ? অঢেল দিয়েও ফুরাবে না। কিন্তু ফুরিয়েছিল। আজ আমরা ভিখারী। নয় কি ?"

ওর মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। একটু হেসে রামদাসজী বললেন, "কী, ভূতের মুখে রামনাম শুনে অবাক হচ্ছেন ? ভাবছেন, ব্যবসায়ী লোকের মুখে এ কী কথা ! হ্যাঁ বাবুজী, যুগটাও নতুন, আমি লোকটাও নতুন। আমার বাবার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা একেবারেই মিলবে না।"

"বুঝলাম। কিন্তু ডলার আর্নিংয়ের অন্যতম কমোডিটি এই ম্যাঙ্গানিজ, কমার্সের ছাত্র হয়ে এটা ভুলবেন না।"

হাসলেন রামদাসজী, বললেন, "সেটা গভর্নমেণ্টের ভাববার কথা, আমার নয়। একবার তো গভর্নমেণ্ট রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক অচল অবস্থার। বিদেশ থেকে দরকারী জিনিসপত্রের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। অতএব বাধ্য হয়ে—"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "কিন্তু সেসব কূট প্রশ্নে আমাদের দরকার কী? প্রস্পেক্টিং করেই দেখা যাক না, কোথায় কী সম্পদ আছে! সঙ্গে সঙ্গেই 'কোয়ারি' তৈরি করে মাল তুলে যে রপ্তানি করতে হবে, তার কী মানে আছে?"

রামদাসজী বললেন, "তাতে আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে আমি রাজী। কোয়ারিও করব, যদি দেশী ফ্যাক্টরি মাল নেয়। আসল কথা, দেশের জিনিস দেশেই থাকুক, আমাদের কাঁচা মাল নিয়ে বাইরের লোক যে সেটা দিয়েই অস্ত্র তৈরি করে আমাদের ওপর ফেলবে, এটা মেনে নিতে রাজী নই।"

"ব্রেভো!" বললাম, "একমত আপনার সঙ্গে। তা হলে আমরা বেরিয়ে পড়ি এখন, কী বলেন?"

রামদাসজী বললেন, "দাঁড়ান, আমিও যাব।"

অতএব একসঙ্গেই কাজ শুরু হল। যা চেয়েছিলাম।

সারাটা দিন খাটবার পর সন্ধ্যায় দু চোখ ভরে জড়িয়ে এল ঘুম। ঘুমে টলতে টলতে বাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম, উঠলাম যার নাম সেই বেলা আটটায় একেবারে। রামদাসজীও সমানে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আবার বেরুলাম, আবার সন্ধ্যায় ফিরলাম শ্রান্ত হয়ে। এমনি করে পর পর তিনটি দিন। চতুর্থ দিন রামদাসজী বললেন, "আজ একটু বিশ্রাম নিন।"

পান্থলুও সমর্থন করল সে-কথা। অস্বীকার করব না, মনে মনে একটু বিরতি চাইছিলামও।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এ কয়দিন কেউ আসে নি আমার খোঁজ করতে। চেট্টিবাবু না, বিশ্বনাথম্‌ও না।

সন্ধ্যায় বললাম রামদাসজীকে, "আমি একটু বেড়িয়ে আসছি।

আজ রাত্রে নাও ফিরতে পারি। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে রামদাসজী ?"

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, বললেন, "না।"

তারপরে একটু থেমে থেকে আবার বললেন, "বাবুজী, একটা কথা ভাবছি। ভাবছি 'দেবীপল্লী' উঠিয়েই দেব। ও-বাড়িটাকে ধর্মশালা বানিয়ে দেব। আপনি কী বলেন ?"

বললাম, "তা কেন ? ওরা কী অপরাধ করল ? কিছু করবেন না।"

"বেশ। আপনি যখন বলছেন, তখন—"

"হ্যাঁ, আমার কথাটা আপনাকে রাখতেই হবে।"

বলে দ্রুতপায়ে চলে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কিছুটা রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। সোজা গেলাম ভামতীর বাড়ি। হয়তো অভিমান করবে, রাগও করবে। আমি তা করব না। বলবও না কিছু। শুধু বলব, "কাজের চাপ পড়তে পারে না ? আমি কি কুড়ে, অকেজো লোক নাকি ?"

দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। বুড়ী ঝিটির পাশ কাটিয়ে একেবারে সরস্বতী আম্মার ঘরে। দেখলাম, অনেকটা সুস্থ তিনি। বালিশের পর বালিশ সাজিয়ে, তাতে ঠেস দিয়ে বসে আছেন জানলার দিকে মুখ করে। ঘরে আর-কেউ নেই।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, আমাকে দেখে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, বললেন, "এ কয়দিন আস নি কেন ?"

বললাম, "ভামতী কোথায় ?"

"ও-বাড়ি গেছে।"

"ও !"

বসে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, আর প্রতিটি মুহূর্তেই আশা করতে লাগলাম তাকে। এখুনি ফিরে এসে আমাকে দেখে সে চমকে যাবে। প্রথমেই হয়তো কথা বলবে না, মুখ ভার করে থাকবে। কিন্তু সময় পার হতে লাগল। কোথায় সে ? অবশেষে বলেই ফেললাম, "এখনও আসছে না কেন ?"

"কে? ভামতী? সে তো আসবে না। আজ থেকে ও-বাড়িতেই সে থাকবে।"

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। মুখ দিয়ে আপনিই বার হয়ে গেল, "সাত দিন তার ছুটি ছিল না? এখনও তো সাত দিন পুরো হয় নি।"

"না। কিন্তু কী যে মেয়ের মতিগতি, অত করে তোমার নাম ধরে বললাম, সে আসবে। তবু শুনল না, জোর করে চলে গেল। বললে, তুমি ভাল হয়ে গেছ, মিছিমিছি ছুটির দরকার নেই।"

বললাম, "দাঁড়ান, তাকে ধরে নিয়ে আসছি।"

কিন্তু কাকে? চেট্টিবাবু খাতার পাতায় দেখাল তার নাম, 'বেলফুল'—লালকালি দিয়ে কাটা।

ছুটে চলে এলাম। কিন্তু পরদিন সকালেই গেলাম সরস্বতী আম্মার বাসায়। মাকে দেখতে নিশ্চয়ই একবার সে আসবে। মিথ্যা হল না আমার অনুমান, দেখা হল তার সঙ্গে. সরস্বতী আম্মা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন পাশের ঘরে, পুজোয় বসতে। আর ও দাঁড়িয়ে রইল অদূরে, জানলার কাছে দুটি লোহার শিক শক্ত করে দু হাতে ধরে।

বললাম, "তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে ঢুকলে কেন? আমায় এড়াতে? কী অপরাধ আমি করলাম?"

উত্তর এল না। উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার করলাম আমার প্রশ্ন। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিল, বললে, "সে রাত্রে খেতে এলে না কেন?"

"তুমি তো জানই।"

"আমার থেকে নটরাজনের বীণাই তোমার কাছে বেশী হল?"

বললাম, "সে বীণা যে তুমিই।"

"তার মানে?"

বললাম, "নটরাজনের কাছ থেকে সেদিন আমি সব শুনেছি, সব বুঝেছি।"

"কী বুঝেছ!" বলে চট করে ফিরল আমার দিকে, তারপরে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "কিচ্ছু বোঝ নি। বোঝা অত সহজ নয়।"

বলে উদ্গত অশ্রু রোধ করতেই সম্ভবত ছুটে চলে গেল রান্না-ঘরের দিকে। আমি পিছন পিছন অনুসরণ করে গিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরের আগড়টা সে টেনে বন্ধ করে দিল। বুঝলাম, এখন আর সে বেরুবে না আমার সামনে। চলেই আসছিলাম, হঠাৎ কী মনে করে ফিরে গেলাম আগড়ের কাছে। প্রশ্ন করলাম, "নামটা জানতে পারি কী? আজ কী নাম হবে তোমার?"

বন্ধ আগড়টার ও-পাশ থেকে উত্তর এল, "জানি না, যাও।"

সরস্বতী আম্মা পূজায় বসেছেন। গোলযোগ না বাড়িয়ে চলে এলাম চুপিচুপি।

সে সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়িই গেছি। নিজেরই ব্যস্ততার জন্য চোখ পড়ে নি। হাতবাক্সটার কাছে খাতা খুলে দুজনেই ওরা বসে থাকে, চেট্টিবাবু আর বিশ্বনাথম্। চেট্টিবাবু আমাকে দেখামাত্রই কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিল বিশ্বনাথম্, বললে, "আজ তোমাকে অনিয়ম করতে দেব না। ফুলের নাম করুক বাবুজী। নবগ্রহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা এভাবে ভাঙলে পাপ হবে না তোমার?"

চেট্টিবাবু তাকাল তার দিকে, বললে, "কিন্তু তুমি তো ধর্ম মান না?"

বিশ্বনাথম্ বললে, "ট্রেডের খাতিরে মানছি। এটা আমার ট্রেড। জীবিকাও বটে।"

"কী বললে!"

বিশ্বনাথম্ সুর নামিয়ে বললে, "যাই বলে থাকি, অনিয়ম তুমি করতে পারবে না। নাম করবেন বাবুজী? ফুলের?"

করলাম কী যেন একটা ফুলের নাম। টাকাটা হাত পেতে নিয়ে বিশ্বনাথম্ বললে, "আসুন আমার সঙ্গে।"

গেলাম ভিতরে। কিন্তু এ যে অন্য মেয়ে! বললাম, "না। থাক্।"

"না বাবুজী, তা হবে না।"

"তার সঙ্গে যে আমার দেখা হওয়া দরকার।"

"উপায় নেই।"

বললাম, "বেশ। এই মেয়ের সাহায্য নিয়েই তার সঙ্গে দেখা করব।"

"পারবেন না। তাকে আমি নিজে গিয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। তার ধর্মভয় আছে। সে সাহস করবে না। আর আপনি যদি জোর-জবরদস্তি করেন, এবং তাতে চেট্টিবাবু যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তা হলে আমার যে লোকবল নেই, তা ভাববেন না।"

অদ্ভুত রুক্ষ আর কঠিন দেখাচ্ছিল বিশ্বনাথমের মুখ। বললে, "আমিই এখন এখানকার পুরোহিত, চেট্টিবাবু নয়। এবার থেকে আমারই নাম ধরে লোকে ডাকবে, 'চেট্টিবাবু'। ওকে নয়। ও যে নারায়ণা, সেই নারায়ণাই হবে আবার।"

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "ওর আসল নাম তা হলে 'চেট্টিবাবু' নয়?"

"মোটেই না।" বিশ্বনাথম্ বললে, "দস্তুরমত বামুনের ছেলে ও। এখানকার ও-কাজটা করত বলে লোকে নাম দিয়েছিল 'চেট্টিবাবু'। সেই নামেরই চল্ হল। ও-ও কানে মাকড়ি পরে চাল-চালনে 'চেট্টি' সাজল।"

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওর কথা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলাম। যেন অন্য একটি দিক আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণের 'চেট্টি' অর্থাৎ 'বণিক' সাজা, এ যেন এক সুগোপন কান্নারই রূপান্তর বলে মনে হল। সত্যিই তো, কতটুকু আমরা জানি মানুষের মনের আর জীবনের? কতটুকু জানতে পারি বাইরে থেকে?

বিশ্বনাথম্ বললে, "আমার অত সেন্টিমেন্ট নেই। পিতৃপরিচয়-হীন এক অভাগা মায়ের কোলে এসে জন্মেছিলাম। ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে বড় হয়েছি। স্পেড্‌কে স্পেড্ বলতে জানি। তবে এখানকার এসব মানতে হয় ডিসিপ্লিনের জন্য। আপনাদের ওসব ভাবালুতার অর্থ

বুঝি না। প্রীতি, প্রেম—এসবই পরিবর্তনশীল। তবে অত কাতর হন কেন?"

"কে বললে! কাতর আমি হই নি।"

"খুবই ভাল।" বলে সে সরে গিয়ে দাঁড়াল অদূরে, একটা থামের পাশে।

মেয়েটি বোধ হয় আমাকে চিনেছিল। বললে, "কবি, আসুন। নাচ দেখাব।"

যন্ত্রের মত ভিতরে গিয়ে বসেছিলাম। কোন কিছুতেই মন ছিল না। কী যে সুর বাজাল যন্ত্রীরা, কী যে নাচ সে নাচল, কে জানে! একবার মনে হয়েছিল নটরাজনের কথা। কিন্তু তার ধ্যানভঙ্গ করেই বা লাভ কী?

অবসন্ন মন নিয়ে একসময় উঠে চলে এলাম বাইরে। মেয়েটা কী যেন খাবার এনে রেখেছিল সামনে, বার বার অনুরোধ করেছিল খেতে। সামান্য একটু মুখে তুলেছিলাম মাত্র, খাওয়ার স্পৃহা ছিল না।

চেট্টিবাবু তেমনি বসে ছিল, বললে, "বিশ্বনাথম্ কই?"

বললাম, "কে জানে! ভিতরেই হবে। পাহারা দিচ্ছিল আমাকে। যাতে ভামতীর কাছে না যাই।"

শুনে, কী আশ্চর্য, হঠাৎ ছলছল করে এল চেট্টিবাবুর দুটি চোখ। বললে, "তোমার ব্যথা বুঝি! কিন্তু আমারও কিছু করবার নেই।"

"জানি।"

সে বললে, "বিশ্বনাথম্ গেছে সরোজার কাছে, তাকে বোঝাতে। অথচ সরোজা কি কিছু বুঝতে চাইবে? চাইবে না। সে চলে যাবেই।"

"কোথায়!"

চেট্টিবাবু বললে, "কাশীতে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ। এখানকার সব ভার ওই বিশ্বনাথমের উপর দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি কাল।"

"কেন নারায়ণম্ ?"

চমকে তাকাল আমার চোখের দিকে, একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে বললে, "ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ করলাম না, বৈশ্যবৃত্তি করে কাটালাম।"

"কে না কাটাচ্ছে এ-যুগে!" বললাম, "কিন্তু যাচ্ছ কেন হঠাৎ ?"

"হঠাৎই একদিন যেতে হয়।" বললে, "যা ঘটতে একদিন তোমরা দেখ, সত্যিই কিন্তু একদিনে তা ঘটে না, তার পিছনে থাকে বহুদিনের অলক্ষ্য প্রস্তুতি। যা হয়, তা হবার জন্য অনেক দিন থেকেই গড়ে ওঠে আয়োজন নেপথ্য প্রদেশে। তবে ভাই, এ-ও জানি, যাচ্ছি বটে, কিন্তু ভয়ানক কষ্টেই কাটবে বাকিটা জীবন।"

"কেন ?"

বললে, "অপরাধ করেছি নবগ্রহের কাছে। এঁরা বড় জাগ্রত দেবতা। নিস্তার নেই।"

"কিন্তু অপরাধটা কী ?"

উত্তরে যা বললে নারায়ণম্, সে এক অভূতপূর্ব কাহিনী। বললে, "শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের সংলগ্ন যে ঝিলটা দেখেছ, তাতে স্নান করে ওরা ফুল তুলে আনে বাগান থেকে সেই ভোরে। তারপরে মন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরে আসার সময় হয় একটা লটারি। নয়টি ফুলের নামে নামকরণ হয় মেয়েদের। আমিই পুরোহিত হতাম নিজে এ ব্যাপারে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী ?"

কেমন যেন কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে, "সরোজা আসবার পর পৌরোহিত্য আমার গেল। বিশ্বনাথমের ওপর এ সব ভার দিয়ে আমিও হয়ে দাঁড়ালাম পথিকদের একজন। বিশ্বাস করবে ? সেই যে তুমি গিয়েছিলে 'সেবন্তী'র কাছে ? তারপর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে নাম দেখে রাখতাম সরোজার। কিন্তু একবার মনে হল নবগ্রহের মূর্তি ছুঁয়ে এ কী মিথ্যাচরণ করে চলেছি আমি! আমারই নিয়মের অস্ত্র একদিন কিন্তু আমারই ওপর এসে পড়ল তার তীক্ষ্ণতা নিয়ে।"

"কী রকম ?"

বড় বিপদভরা ক্লান্ত মনে হল চেট্টিবাবুর কণ্ঠস্বর, বললে, "ঘটনাটা শুনতে চাও ভাই ?"

"চাই।"

বললে, "একদিন সন্ধ্যায় নিজের পূজা শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল মন্দিরে। এসে দেখি, সেদিন ওর নাম হয়েছে কৃষ্ণ-চূড়া। আর সেই নাম লাল-কালি দিয়ে কাটা। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরেছি, সারারাত ঘুমোতে পারি নি। সে যে কী দাহ, সে কী মর্ম-বেদনা, তা ভাষায় তোমাকে আমি বোঝাব কতটুকু ? সত্যি ভাই, সেদিনই বুঝলাম, কী মর্মান্তিক কষ্ট হয় তোমাদের যেদিন দেখা পাও না তোমাদের মনোমত প্রিয়ার। কাছে আছে, অথচ নেই। এর থেকে দূরে থাকা অনেক—অনেক ভাল।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নারায়ণম্ আবার বললে, "সরোজা নিজেই একদিন এসে সামনে দাঁড়াল প্রেতিনীর মত। সেই রূপকে আমি বড় ভয় করি। বললাম, 'এমন করছ কেন ?'

দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে ও যেন বিহ্বল হয়ে গেছে, বললে, 'এইজন্যে কি এখানে এসেছিলাম ?'

উত্তরে বললাম সব কথা খুলে।

ও বললে, 'বুঝি না আমি সে সব। আমি সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পেরেছি, তুমি তা পার না ?'

বললাম, 'পারতেই হবে।'

'তাই, কাল আমরা দুজনে চলেই যাচ্ছি ভাই।'

এবং সত্যিই তাই হল, পরদিন ওরা দুজনে চলে গেল কাশীতে। সরোজা আর নারায়ণম্।

বাড়িতে রামদাসজী বললেন, "আর প্রস্‌পেক্‌টিং করবেন না ?"

"না। থাক্ না বন্ধ। যা করেছি, তারই ফলাফলের খবরটা আসুক, তখন দেখা যাবে।"

"বেশ, তাই হবে।"

মনের মধ্যে কিসের প্রতিক্রিয়া ঘটছিল কে জানে, হঠাৎ বলে ফেললাম, "রামদাসজী, আপনি ওই 'দেবীপল্লী' তুলে দেবার কথা বলছিলেন না ? তাই করুন। তুলেই দিন।"

রামদাসজী উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকালেন, "আপনি রাজী তো ?"

"নিশ্চয়ই রাজী।"

অবশ্য, ঘটনাটি যে এত সত্বর ঘটবে, ভাবতে পারি নি। রামদাসজী এক মাসের নোটিসে ওদের উঠে যেতে আদেশ জানালেন, ও-বাড়িটাকে করবেন ধর্মশালা। তা ছাড়া, নতুন আইনও তাঁর স্বপক্ষে।

বলা বাহুল্য, বিপুল আলোড়ন জাগল।

একদিন এল ডাক। বিশ্বনাথম্ নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে এল একদিন সকালে, একেবারে সরস্বতী আম্মার বাসায়। শুনলাম, ভামতীও এসেছে মায়ের কাছে।

বোধ হয় কথা বলছিলাম ওঁদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসে আমরা তিনজন—আমি, নটরাজন আর বিশ্বনাথম্। কী হবে এই মেয়েদের ? নটরাজন বললে, "এদের আমি নাচ শেখাব। এদের 'শিল্পী' করে তুলব 'ভরতনাট্যমে'র, বিশেষ করে 'কুচিপুডী' নৃত্যধারার।"

বিশ্বনাথম্ বললে, "এরা হচ্ছে ক্রিচার অব সারকমস্টান্সেস। শিল্পী-জীবন কাকে কতটা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।"

এই সব আলোচনায় আমরা মগ্ন, হঠাৎ দেখি, ভিতর থেকে বাইরে এল ভামতী। সবুজ পাড়ের সাদা বুটিদার একটা শাড়ি পরনে, গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউজ। অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে চেহারায়। যে-মেয়ে এ কয়দিন পালিয়ে বেড়িয়েছে আমার কাছ থেকে, আজ সবার সামনে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "শোন।"

আশ্চর্য হয়েই চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে। আমাকে লক্ষ্য করে বললে, "তোমাকেই বলছি। এস আমার সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাব।"

আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমার পাশাপাশি চলতে লাগল সে। না মন্দির নয়, ও বললে, "অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পার আমাকে এখন?"

"কোথায় বল তো?"

"ওই পাহাড়টা পেরিয়ে—"

উৎসাহিত হয়েই বলে উঠলাম, "পারবে যেতে? সুন্দর একটা ঝরনা আছে। তোমাকে দেখিয়ে আনব।"

সংক্ষেপে বললে, "চল।"

সেই মেঘমলিন দিনটিতে পর্বতের সানুদেশে কী যে চমৎকার বর্ণ ধারণ করেছিল সেই ঝরনাধারাটি, তা বলবার নয়। ঈষৎ নীলাভ একটা কুয়াশার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে যেন লজ্জাশীলা নববধূর মত। দুজনে সেই খয়েরী পাথরটার উপরে বহুক্ষণ বসে রইলাম পাশাপাশি। চুপচাপ।

একসময় বললাম, "খুব রাগ করেছিলে, না?"

"করবই তো। কাঁদিয়েছিলে তুমি আমাকে। ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। অভিমানও।"

"ক্ষমা কর।"

উত্তরে কিছু না বলে আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিশ্চুপে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বলে উঠলাম, "এই যে এভাবে চলে এলে, ওরা কেউ কিছু মনে করল না তো?"

"এ কথা তোমার মনে হল কেন?"

"এমনি।"

বললে, "নটরাজনের কথা তুমি শুনেছ, না?"

অল্প একটু হেসে চুপ করে রইলাম। চুপচাপ চারিদিক। ঝিরঝির করে ঝরনার একটি ধারা বয়ে চলেছে আমাদের কাছ দিয়ে, সেই দিকে দুটো-একটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একসময় বলে উঠল, "শোন।"

"কী ?"

"একটা রহস্য ভেদ করে দিতে পার ?"

"কী ?"

"মনের মধ্যে এই আবেগের সৃষ্টি করে কে ? কে হঠাৎ ভিতর থেকে বলতে থাকে—এই-ই সেই, যাকে তুমি খুঁজছ। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি তাকে। তার চলার ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, তাকাবার ভঙ্গি—সব-কিছু ভাল লাগতে থাকে।"

একটু থেমে, ধীর কণ্ঠে বললে, "মিথ্যে বলব না, নটরাজনকে দেখেও একদিন আমার ও-রকম হয়েছিল। একটি মুহূর্ত ওকে না দেখলে মনে হত, বুঝি পাগল হয়ে যাব।"

"খুব ভালবাস বুঝি ?"

দীর্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "কেমন করে তোমাকে বোঝাব ! সেই লোক, যার কণ্ঠস্বরটুকু শুনলেও নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, তার আজ কিছুই ভাল লাগে না আমার। তুমি বিশ্বাস করবে ? তার সঙ্গও বিস্বাদ লাগে।"

বললাম, "এ-রকমটাও হয় নাকি ?"

"হয়।" আশ্চর্য এক কণ্ঠে ও বলতে লাগল, "আজ আমাকে ঠিক তেমনি করে পাগল করেছ তুমি। তোমাকে একটি মুহূর্ত কাছে না পেলে বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে মরে। তুমি চলে গেলে, আমি কী করব বল তো ?"

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপরে বললাম, "আমাকে কি কাছে পেতে চাও অনুক্ষণ ?"

সেই নির্জন নিভৃত পার্বত্য-প্রদেশে আমাকে দুটি বাহু দিয়ে কাছে টেনে নিল সে, যেন প্রমত্ত হয়ে উঠল মুহূর্তে, ডেকে উঠল, "কবি !"

বললাম, "এই ঝরনার ধারেই আমি এসে বসতাম অবসর পেলে। দেখে দেখে চোখ সত্যিই উঠত ভিজে। কী যে আনন্দ হত ! কেন এমন হয় বলতে পার ?"

খুশির তরঙ্গে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল মুহূর্তে, বললে, "আমি জানতাম।"

"কী?"

"তোমার মধ্যে এমনটি হবে। এই বিশ্বসৌন্দর্য চোখ মেলে দেখে কজন? কজন দেখে আনন্দ-রসে মগ্ন হতে পারে? আমি জানি, তুমি তা পারবে।"

বললাম, "ঠিক বুঝি না তোমার কথা, তবে দিন দিন যে পরিবর্তনের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বেশ বুঝতে পারছি।"

হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা। আমাকে না দেখে থাকতে পার না বুঝি?"

বললাম, "কষ্ট হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন শিউরে উঠল, বললে, "কী হবে!"

"কিসের কী?"

"তুমি যদি সত্যিই ভুলতে না পার আমাকে?"

একটু অবাকই হলাম ওর কথায়, বললাম, "এ-কথা আসছে কেন?"

একটা আশ্চর্য কথাই শুনলাম। ও বললে, "সহজে ধরা দাও না তোমরা। কিন্তু যদি একবার ধরা পড় তো তোমাদের অবস্থা হয়ে পড়ে শিশুর মত। সেটাই চিন্তার।"

"কেন?"

অকস্মাৎ কান্নার আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ, বলতে লাগল, "তোমার ভালবাসা পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা, জান?"

"কেন?"

"গভীরতার জন্য।"

বাড়ি ফিরে আসার পর একসময় নটরাজন এসে দাঁড়াল কাছে, বললে, "ওকে ভালবাস তা জানি। থাক না এখানে ওকে নিয়ে চিরজীবন। ও-ও সুখী হবে।"

একটু হেসেই বললাম, "কী করে জানলে?"

বললে, "মেয়েদের ভালবাসার দুটি প্রকৃতি আছে। এক, সংস্কার বা অঙ্গীকারের কাছে আত্মসমর্পণ। আর-একটি হচ্ছে, মুক্ত মনের বিকাশ। এই মুক্ত মন কখনও বাঁধা পড়ে না। পড়লে, সে হয় অপার্থিব, অসামান্য এক কাব্যলীলা। ওর হয়েছে তা-ই। তোমাকে না পেলে ও মরে যাবে।"

বললাম, "তোমার কষ্ট হবে এতে?"

"ছিঃ!" তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, "বলছ কী তুমি! শুধু একটা কথা। নৃত্যশিক্ষার সুযোগটুকু দিও। অমন ছন্দোময় দেহ-সৌষ্ঠব সহসা চোখে পড়ে না।"

পরদিন সকালবেলা গিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। সরস্বতী আম্মা আমাকে কাছে বসিয়ে নানান গল্প করতে লাগলেন। তার পরে বললেন, "যাও, পাশের ঘরে যাও। ওর পুজো সারা হয়েছে।"

গেলাম। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটির মতই ঝরঝর বর্ষণ শুরু হয়েছে। গবাক্ষের বাইরে সেদিনের মতই চলেছে কৃষ্ণ-মেঘপুঞ্জের লীলা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার লক্ষ্য করতে করতেই বলে উঠলাম, "শুনছ? কী ঠিক করলাম জান? যাব না। ঘর বাঁধব এখানে। তুমি আর আমি।"

আমার পায়ের কাছে এসে বসল মাটিতে। তারপরে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বাইরে চলেছে ঝরঝর—ঝমঝম বৃষ্টি। বাড়িতে নেই নটরাজন। একটা ময়ুর কোথায় যেন ডাকছে প্রমত্তের মত।

বললে, "এত লোভ দেখাও কেন তুমি?"

"লোভ!"

বললে, "এর থেকে লোভের বস্তু, আমার কী থাকতে পারে?"

খাটিয়ার প্রান্তে বসে পড়ে, ওর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলতে বুলতে ডেকে উঠলাম, "ভামতী!"

"উঁ ?"

বললাম, "দুজনে যেমন সেই ঝরনার কাছে গিয়েছিলাম, তেমনি মাঝে মাঝে যাব বেড়াতে। তুমি আর আমি—দুজনে। কেমন ?"

"তার পর ?"

"তার পর ? একদিন শুধু ওই ঝরনা নয়, দেশ-বিদেশ। যাব সমুদ্র দেখতে, তুমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবে, কী সুন্দর !"

"আর তুমি ?"

"আমি ? আমি দু চোখ ভরে দেখব তোমার সেই অবাক-হওয়া দুটি চোখ।"

থরথর করে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট দুটি, কান্নাভরা কণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠল, "বোল না অমন করে। ওগো, একটা কথা বলব ?"

"বল।"

দুটি অশ্রুভরা চোখ আমাব দিকে মেলে বলে উঠল, "কালই তুমি চলে যাও এখান থেকে। দেরি কোর না।"

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, "কেন ?"

অস্থির অসহিষ্ণু, অথচ দুঃখদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ভামতী, "রামচন্দ্র যেমন সীতাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমাকে তেমনি করে ত্যাগ করতে পারবে না তুমি ?"

কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আমার বুক, বললাম, "কী হয়েছে বল তো ?"

বললে, "কী জান ? বিষাক্ত হয়ে গেছে আমার মন। তাই ভয় হয় গো, তাই ভয় হয়।"

"কিসের ভয় ?"

আমার পায়ে ঠোঁটের ছোঁয়া রেখে বার বার বলতে লাগল, "সবই তো তুমি জান, সবই তো বলেছি আমি তোমাকে।"

"তাতে হয়েছে কী ? পিছিয়ে যাচ্ছ কেন ? আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমার দেশে, আমার ঘরে।"

"ওগো, না গো না," বলে উঠল সে, "সে কামনা কোর না। আমি

সব থেকে ভয় করি নিজেকে। আজ তোমাকে যেমন ভালবাসি, একদিন তো অন্যকেও ভালবেসেছিলাম। যদি আবার সেইরকম কিছু ঘটে? যদি আবার পুরনো হয়ে যায় আমার প্রেম? যদি একদিন তোমারই সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য লাগে?"

সুকঠিন বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই চেয়ে ছিলাম ওর দিকে। সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে যেন আর্তনাদ করে উঠল ও। সহসা বললে, "অমন করে আমার দিকে চেয়ো না। তুমি পুরুষ, তোমার এ দুঃখ দুঃখই থাকবে না একদিন। না না, তুমি বাঁধা পড়ো না, তুমি চলে যাও।"

প্রস্তরখণ্ডের মত নিথর-নিশ্চুপ বসে ছিল বহুক্ষণ, মনে আছে। একসময় বলে উঠেছিলাম, "সরস্বতী আম্মার কথাও তো শুনেছি। কিন্তু তিনি তো—"

বাধা দিয়ে বলে উঠল, "মায়ের মনের দৃঢ়তা, মায়ের তপস্যার শক্তি, সে আমার নেই। আমি তাই ভরসা করি না তোমাকে কাছে রাখতে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, "পার তো আমাকে ঘৃণা কোর, ভালবেসো না।"

বৃষ্টিটা ততক্ষণে ধরে এসেছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "যাওয়ার আগে একটিবার দেখা হবে কী?"

দুই পিপাসিত দৃষ্টি মেলে বললে, "হবে গো হবে।"

তারপরে মুখখানা নত করে ধরা গলায় বললে, "আজ সন্ধ্যায় এস ও-বাড়িতে। আজকাল তো আর ওসব কড়াকড়ি নেই। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

বলেই প্রণাম করল পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। বললে, "হাতের আংটিটি কখনও কাছছাড়া কোর না, ওই পোখরাজ-মণিই তোমাকে রক্ষা করবে আমার মোহ থেকে।"

ম্লান একটু হেসেছিলাম মাত্র, আর-কিছু বলি নি। চলেই আসছি, বাইরের ঘরের চৌকাটে পা দিতে-না-দিতেই পিছন থেকে শুনতে পেলাম ওর ডাক, "শোন।"

দাঁড়ালাম। এঘরেও তখন ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। আমার একটি হাত দু হাতে ধরে দুটি জলভরা চোখে বললে, "আমার কথা হয়তো মনে পড়বে, কিন্তু তবু ভেবো না আমার কথা। আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কত ছলনাময়ী, আমি যে কত নিষ্ঠুর, আমি যে কত মায়াবিনী, আমি যে কত—"

শেষ করতে পারলে না কথা, দু হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল, যেন আশ্রয় নিল গিয়ে কক্ষান্তরের নিভৃতে।

সারাটা দিন ওই বৃষ্টিভরা আকাশটার মতই থমথমে মন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম সেই দিনটা। রামদাসজীকে বললাম, "দেশে যাব ভাবছি, মনটা হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছুটি নিলাম।"

মুখে ওঁকে এ-কথা বলেছি বটে, মনে মনে বেজেছে অন্য সুর। মনে হয়েছে, সন্ধ্যায় দেখা হলে ও বলবে, "কী বলতে কী বলেছি, আমাকে নিয়ে চল তুমি, যেখানে খুশি, কিংবা মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তুমিও থাক এখানে, চিরদিনের মত।"

কিন্তু ভুল হল সে আশা।

সেই বাড়িতে, সন্ধ্যাবেলা, ওর সেই ঘর খুঁজে খুঁজে বার করলাম, দেখি, ঘর বন্ধ, প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে ঘরের দরজায়।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওই তালাটিকেই। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। শুধু নটরাজনের ঘর থেকে ভেসে আসছে বীণার-সুর, হাহাকারের মত—কান্নার মত! ধীরে ধীরে ওর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা। আমাকে দেখতে পেয়েই একসময় ও থামিয়ে দিল বীণা। তারপরে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। নিশ্চুপেই একটা হাত তুলে দিল আমার কাঁধের উপর। প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল, বললাম, "কোথায় ভামতী?"

বললে, "জানি না। তবে, আমার কাছে কাল এসেছিল।

তুমি তো জান, আজ কাল আমি এ-বাড়িতেই থাকি। ভামতী যা কোনদিন করে না, তাই করেছিল কাল। আমার ঘরে ঢুকে হঠাৎ প্রণাম করেছিল আমার পায়ে। বলেছিল, 'আমাকে নাচ শেখাতে চাও, না? শেখাও। কাল সন্ধ্যায় এসো আমার ঘরে। দিও আমাকে তোমার নাচের প্রথম পাঠ। আমার 'নট্টুভান' হিসাবে তোমাকে বরণ করে নেব'।"

একটু থেমে তারপরে আবার বললে নটরাজন, কিন্তু কাল ঘরে এসে যখন কথা বলছিল, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, ও প্রচণ্ড ভুল করেছে। ভেবেছে, আমার কামনার বহ্নি বুঝি নেবে নি। ভেবেছে, আমি বুঝি আজও ওকে চাই। ভেবেছে, মনের কোণে আজও বুঝি জেগে আছে ওকে কাছে পাবার সূক্ষ্ম কামনা!"

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, "তার পর?"

নটরাজন বললে, "কিন্তু আমার মনের ভাব আমি ওকে বুঝতে দিলাম না। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যে আমার ঘটে গেছে, এটা বুঝতে পারলে ওর আত্মাভিমানে ঘা লাগতে পারে। মেয়েদের মন তো? এসব ব্যাপারে ভয়ানক অভিমান থাকে ওদের। তাই বললাম, বেশ। যাব।

নটরাজন থামলে। বললাম, "গিয়েছিলে?"

উত্তর এল, "না। ও যে থাকবে না, এ-ও জানতাম।"

"ওর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে?"

নটরাজন বললে, "তাও শুনলাম। কিন্তু কখন থেকে যে ঝুলছে, তা কেউ জানে না। দেখছ তো, বাড়ির অবস্থা? নিজের নিজের ইচ্ছামত সব মেয়েই চলে গেছে কোথায়-কোথায় যেন। আছে শুধু আমার ছাত্রী ভারাহালু, আর অন্য দুটি মেয়ে। এরা ভালভাবে সত্যিকার নাচ শিখবে, শিল্পী হবে। আমি এদের নিয়ে যাব 'কুচিপুডী' গ্রামে।"

বললাম, "আচ্ছা? ভামতীর খোঁজ করেছ তার বাড়িতে?"

"না।"

"এস না, খুঁজি।"

"বেশ। চল।"

প্রথমেই গেলাম বিশ্বনাথমের কাছে।

বিশ্বনাথম্ বললে, "বেলা বারোটা নাগাদ ভামতী এসে ঘরের চাবি দিয়ে গেছে ওর হাতে, বলেছে, সে বাড়ি যাচ্ছে, মায়ের কাছে।"

কিন্তু মায়ের কাছেই বা কোথায় ভামতী ?

নটরাজন ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার নিজের ঘরে, সরস্বতী আম্মা বসলেন গিয়ে পূজায়। ডাকলেন শুধু আমাকে। বললেন, "তুমি আমার কাছে এস।"

বসলাম গিয়ে কাছে। পুজোর আসনে বসেও স্থির থাকতে পারছেন না তিনি, বার বার চোখে জল এসে পড়ছে, কথা বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে কথা, দেবতার ধ্যানের জন্যও আপন চিত্তকে ধরে রাখতে পারছেন না। বললেন, "সে বিকেলের দিকেই রওনা হয়ে গেছে বাবা। বলেছে, কোনও মন্দিরে সে আশ্রয় নেবে। দূরের নিভৃত কোনও মন্দিরে।"

"কিন্তু কেন ?"

সরস্বতী আম্মা বললেন, "মন্দিরই তো আমাদের শেষ আশ্রয় বাবা। কেউ ঘরে বসেই মনটাকে বাঁধতে পারে, তখন তার কাছে ঘরটাই হয়ে ওঠে মন্দির। আর তা যে না পারে, তাকে ছুটতে হয় মন্দিরে। কাঁদতে হয়, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে হয়, বলতে হয়—ওগো প্রিয়তম, আমার মনটাকে তোমার মন্দির করে দাও। মন ধীর মন্দির।"

বললাম, "কিন্তু মা, আমাকে সে শেষ পর্যন্ত ভয় করল ?"

"তোমাকে নয় বাবা।" সরস্বতী আম্মা বলতে লাগলেন, "আমি তাকে জানি। তার ভয় শুধু নিজেকে। তাই সে পালাল। আমি সব দেখে শুনে যেতে দিলাম, যাক ও যেখানে খুশি, শান্তি পাক। দুঃখ কোর না, তোমাকে সে প্রাণ ঢেলেই ভালবাসে। এই প্রেমকে

সে পেতে চায় ধ্যানের মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে, প্রেমকে সে প্রদীপ করতে চায়। কথাটা তুমি হয়তো আজ বুঝবে না, বুঝবে অনেক পরে। আমাদের মতন বয়সে যখন জীবনের সমস্ত ধূপ জ্বলে জ্বলে স্মৃতির ভস্ম-টুকু পড়ে থাকে মাত্র মনের কোণে।"

'আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কত ছলনাময়ী, আমি যে কত মায়াবিনী, আমি যে কত—!'

আজও মাঝে মাঝে কানের কাছে অতর্কিতে বেজে ওঠে তার সেই কণ্ঠস্বর।

কত দিন, কত মাস, কত বছর কেটে গেছে, কত পরিবর্তন এসেছে আমার জীবনে। দুঃখ-সুখের কত পালার মধ্য দিয়ে পার হয়ে চলেছে আমার জীবন। কত নিষ্ঠুরতা, কত হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই দৈনন্দিনতার মধ্যে। কত মিথ্যা, কত হীনতা এসে আঘাত দেয় প্রাণের মধ্যে—তবু সংশয়ের মেঘে ঢেকে যায় না মনের আকাশ। যখন চারিদিকে শুনি নৈরাশ্যের হাহাকার, কিছু হচ্ছে না, কিছু হয় নি, কিছু ভাল নয়, কেউ ভাল নয়, সব খারাপ। তখন অনুকম্পা জাগে। আমি যে জানি, নিশ্চয়ই আছে কোথাও আলোকের রাজ্য। অতীতেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আজও মানুষ মানুষকে ভালবাসছে দেখলে খুশী হয়ে ওঠে মন, আজও প্রকৃতির শোভা দেখে ভরে যায় দুটি চোখ। মনের কন্দরে আজও উঁকি দেয় কোনও 'ছলনাময়ী' আজও বুঝি মধুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে কোনও 'মায়াবিনী'—"কবি!"

না। তাকে ঘৃণা করতে পারি নি। আজও তার দেওয়া পোখরাজ-মণিটির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বিভ্রম ঘটে। মনে হয়, ও বুঝি মণি নয়, কার এক ফোঁটা চোখের জল, চিরকালের জন্য আমার কাছে বাঁধা পড়ে আছে।

লেখক-পরিচিতি

সাহিত্যিকের জীবন প্রায়শই দেখা যায়, দ্বিধা-বিভক্ত। একটি তার সাধনার জীবন, আর একটি তার ব্যবহারিক জীবন, যেটা তার সাধনার উপাদান। একটি জীবন দিয়ে সে রচনা করে, সৃষ্টি করে, অন্য জীবন দিয়ে সে দেখে, অনুভব করে। বস্তুতঃ সাহিত্যিকের এই দুটি জীবনই দেখা যায় প্রায়শ বিচিত্র এবং হয়তো বা সংঘাতপূর্ণ। রচনা দিয়ে যেখানে তাকে রসবেত্তা পাঠকের সম্মুখে আসতে হচ্ছে, সেখানেও গড়ে উঠেছে একটি উত্থানের ইতিকথা, প্রতিষ্ঠার ইতিকথাও বটে। আর তার অন্য যে জীবন, যে-জীবন ব্যবহারিক, যে-জীবনে আসতে হয় নানান লোক, নানান পরিবেশ আর নানান সংঘটনার সংস্পর্শে, সে-জীবনের ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক বটেই। এই দ্বিবিধ জীবন থেকে রস আহরণ করেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের সত্তা। ১৩২৭ সালের ২১শে ভাদ্র (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই সেপ্টেম্বর) কলকাতায় মাতামহের গৃহে শচীন্দ্রনাথের জন্ম। শৈশবে দাদামশায়-দিদিমার সঙ্গে কাটিয়েছেন যতটা বেশী, পিতৃগৃহে ততটা নয়। বিরাট বাড়ি দাদামশায়ের, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' লেগেই থাকত। সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণ ছিল দাদামশায়ের শখ, সঙ্গে আদরের দৌহিত্রটিও বাদ পড়ত না। পরবর্তীকালে মাতামহ অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। বেশ কয়েক বছর পরে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসেন তিনি কাশীর বাড়িতে। দেহ রাখলেন মাতামহ। পিতা তখন বাংলাদেশেরই এক মফস্বল স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। স্বাধীনচেতা শিক্ষক ছিলেন তিনি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আকস্মিক মতান্তর ঘটেছে, তৎক্ষণাৎ কর্মে ইস্তফা দিয়েছেন দ্বিধা করেন নি। অতএব স্থান পরিবর্তন। সারাটা জীবন তাঁর এইভাবে গিয়েছে। পুত্রদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এভাবে ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠানো হল জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রকে জ্যেঠামশায়ের কাছে—যশোর জেলার নড়াল-রূপগঞ্জে। চার বছর এখানে কাটিয়ে শচীন্দ্রনাথ এলেন কলকাতায়, ভর্তি হলেন আশুতোষ কলেজে। সৌখীন অভিনেতা হিসাবে সমালোচক হিসাবে ওঁর একটি পরিচিতি ছিল সেদিন, এক রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন, যুক্ত ছিলেন তখনকার এক নামকরা সিনেমা-সাপ্তাহিকের সঙ্গে। গান লেখেন, কবিতা লেখেন, নাটক লেখেন। সেই বয়সের লেখা 'উত্তরাধিকার' নাটক দিয়ে ৺প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে পরিচিত হন। বড়ুয়ার প্রেরণায় ও বন্ধুদের উৎসাহে সে-নাটক অভিনীত হয়ে বহু রসবেত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শচীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উৎসাহদাতা ওঁর আত্মীয় ও বন্ধু কবি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই উৎসাহে শচীন্দ্রনাথের গল্প রচনার প্রয়াস। প্রথম গল্প দুটির একটি ("বুভুক্ষা") কোন এক গল্প-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে, দ্বিতীয়টি, ("পদধ্বনি") তদানীন্তন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ("দেশ" ঃ ৫ই এপ্রিল ১৯৪১)। সেই থেকে 'দেশ'-এ নিয়মিত লিখেছেন শচীন্দ্রনাথ,—কবিতা আর গল্প। কলেজী-জীবনের চারটি বছর পার করে দিয়ে অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করল। রঙ্গমঞ্চ আর চলচ্চিত্রের জগৎ ছেড়ে অকস্মাৎ গেলেন কারখানার জীবনে, বাইরে। আর্টের ছাত্র গেলেন সায়েন্সে। সরকারী মেটালর্জি বিভাগের পরিদর্শন-শাখার চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষের বহু কারখানায় ঘুরেছেন শচীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে ঘাটশীলার তামার কারখানা অন্যতম। ঘাটশীলা থাকতেই ওঁর পরিচয় ঘটে 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণের সঙ্গে। তখন 'দেশ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লিখেছেন শচীন্দ্রনাথ। ১৯৪৫ সনে বেতার নাট্যপ্রতিযোগিতায় নাটক লিখে অকস্মাৎ একটি পুরস্কার লাভ করেন তিনি। বহুদূর

থেকে ছুটি নিয়ে এসে পরিচিত হলেন বেতারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ফলে, বেতারের জন্য নাটক রচনা।

১৯৪৬ সনে আবার জীবন ও জীবিকার উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তন। এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ফার্মের জাহাজী ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শিক্ষানবিশীকালে এসপ্লানেড মুরিং আর খিদিরপুর ডক থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত নোঙর-ফেলা জাহাজের খোঁজ করে বেড়ানো। সারেঙ মাঝিমাল্লা আর বিদেশী নাবিকদের জীবন ও জীবনদর্শন অদ্ভুত আকর্ষণ করল ওঁকে। বেড়ানোর নেশা তো ছিলই, এবার লম্বা দৌড়। এবারে বিশাখাপত্তম। সাত বছরে অন্ধ্রদেশ ঘুরেছেন যেমন, তেমনি বিভিন্ন দেশীয় নাবিকদের সংস্পর্কে এসেছেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান আর গ্রীক্ থেকে শুরু করে জাপানী পর্যন্ত। এরই ফাঁকে ফাঁকে কর্মব্যপদেশে, বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপ-দ্বীপান্তর, যার পরিচিতি ওঁর বহু রচনায় পাওয়া গিয়েছে। 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত ক্যাপ্টেন কেনেডির গল্প ও পরে 'দেশ'-এ প্রকাশিত আন্দামান নিয়ে প্রথম লেখা, "জাগুয়ার"-এর মধ্য দিয়েই শচীন্দ্রনাথের রচনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতর প্রকাশ ঘটে। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত "অষ্টাদশী"তে "জাগুয়ার" গল্পটি আছে, ওঁর নিজের বইতে আছেই। দ্বীপ নিয়ে বহু গল্প উনি লিখেছেন, যার কোনটাই পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ওঁর প্রথম উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন 'বর্ত্তমান' পত্রিকার কথাশিল্পী সরোজকুমার রায় চৌধুরী, যার নাম 'এ জন্মের ইতিহাস'—ওঁর বহু প্রশংসিত বই। ওঁর জাহাজী জীবনের ডায়রির কিছু অংশ বেরিয়েছিল মহীতোষ রায় চৌধুরীর 'শিক্ষক'-এ ধারাবাহিকভাবে। বিশাখাপত্তমে থাকাকালীন উনি বিবাহ করেন। বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী ওঁর স্ত্রী। ওঁর দুটি পুত্র ও একটী কন্যা অন্ধ্রদেশেই ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুকন্যাটী মারা যায়। চলে আসেন কলকাতায়। সাত বছর ধরে আবার নাট্যজগতের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছেন। এর জন্যও ঘুরতে হয় সারা বাংলাদেশ। সংসারে দুই ভাই, এক বোন। স্ত্রী ও দুটী পুত্র।

বেতারে এখনও নাটক লেখেন মাঝে মাঝে, সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্যও লেখেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের প্রধানতম পরিচয় ঔপন্যাসিক ও কৃতী ছোট গল্প রচয়িতা হিসাবে। মাত্র নূতন পটভূমিকাই নয়, বহুদর্শী এই লেখকের গল্প ও উপন্যাসে প্রকৃত রসের স্বাদ থাকে, যে পরিচিতির কথা আমরা বলব না, বলবেন পাঠক সম্প্রদায়, রসিক সজ্জন। "জনপদবধূ" প্রকাশিত হয়েছিল পূজা-সংখ্যার "জনসেবক"-এ। বর্ত্তমান বইটি তারই পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত রূপায়ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, লেখকের স্বীকৃতি-অনুযায়ী, 'জনপদবধূ' নামটির মূল প্রেরণা' 'মেঘদূত-'এর 'পূর্বমেঘ'-খণ্ডের ষোড়শ শ্লোকটি। "ভ্রূ-বিলাসানভিজ্ঞৈ: প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈ:"—শ্লোকাংশের ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, পল্লীসুন্দরীদের দৃষ্টির সরলতা, আর অপার্থিব গভীর প্রেমেরই ইঙ্গিত করেছিলেন কালিদাস। বক্ষ্যমান গ্রন্থের নায়িকা ব্যবসায়ে ছিল গণিকা, কিন্তু তবু জীবনের ক্লেদ তাকে স্পর্শ করে নি। যে দূরদৃষ্টি আর অন্তরের সম্পদ থাকলে মানুষ ক্রান্তিদর্শী হয়, সেই দৃষ্টিই ছিল তার, এবং ছিল বলেই তার গভীর প্রেমের প্রেরণা একজন 'অ-কবি'কে 'কবি' করে তুললো, একজন বহির্মুখী পুরুষকে করল অন্তর্মুখী। অথবা, সত্যিকার পুরুষটি দেখা দিল তার নির্মোক ত্যাগ করে। এর মূলে নায়িকার যে শুদ্ধ চরিত্রের দ্যুতি প্রকাশমান, তাতে করে তাকে তথাকথিত 'গণিকা' বলে চিহ্নিত করা যায় কেমন করে, কোন্ অশ্রদ্ধা মনে পোষণ করে? সে সত্যিকার বধূ, সত্যিকার পুরুষোত্তম-নায়িকা, প্রীতিস্নিগ্ধ-লোচনা।